আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার দ্বাত্রিংশ গ্রন্থ

ইংরেজী কাব্য-কথা

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম. এ

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

প্রকাশক:—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন্নু ও মন্নু
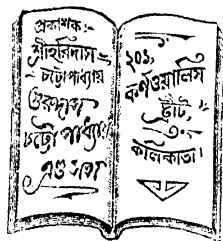
তোমাদের জন্য এই

গল্পগুলি লিখিয়াছিলাম

তোমাদিগকেই

উৎসর্গ

করিলাম

—

ইংরেজী কাব্য-কথা

গডিভা

Tennyson

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কভেণ্ট্রি নামক নগর অধুনা বাইসিকেলের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। পুরাকালে—হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এই নগর সমৃদ্ধিতে প্রসিদ্ধ ছিল। এই কভেণ্ট্রি-নগর-সংক্রান্ত পুরাতন একটি গল্প প্রচলিত আছে; বলিতেছি, শোন।

খ্রীষ্টাব্দ ১০৪৪ সনে এই নগরে পরাক্রান্ত একজন রাজা বাস করিতেন। তাঁহার নাম লিওফ্রিক ও তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর নাম গডিভা।

একদা রাজা প্রজাদিগকে দুর্ব্বহ কর-স্থাপনে পীড়িত

করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রজারা কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল রাণীর সম্মুখে। দুর্দ্ধর্ষ রাজার সম্মুখীন হওয়া তাহাদের সাহসে কুলাইল না। কাঁদিয়া বলিল, "মা, এই কর দিতে হইলে আমরা না খাইয়া মরিব। আপনি না উদ্ধার করিলে আমরা সবান্ধবে মরিব। আপনি উপায় করুন।"

করুণ-হৃদয়া রাণী প্রজার দুঃখে ব্যথিত হইলেন। রাজা বড় জেদী লোক ছিলেন—একবার তিনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না। তবু রাণী রাজার কাছে চলিলেন।

রাজা বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"ছোট লোকের রকমই ঐ। টাকা দিতে হইলেই উহারা মায়াকান্না কাঁদে। ঐ বর্ব্বরগুলার জন্য তোমার অত মাথাব্যথা কেন? তোমার এত দয়ার বড়াই আমি বুঝি না। এই ব্যাটাদের জন্য তোমার অল্প একটুকু কষ্ট সহিতে যদি হইত, তাহা হইলেই তোমায় আর এত দয়া প্রকাশ করিতে দেখিতাম না।

You would not let your little finger ache
For such as these,"

রাণী কহিলেন, "মহারাজ, বল কি, আমি প্রজাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বল, তাহাদের জন্য আমি মরিতে প্রস্তুত।"

রাজা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "এ সব বচনের ছড়াছড়ি। ভারী দায় তোমার যে, তুমি প্রজাদের জন্য প্রাণ পর্যান্ত দিবে। এমন মুর্খ কেউ কি হয়? আমি বিশ্বাস করি না।"

রাণী কহিলেন, "আমায় পরীক্ষা কর। প্রজাদের জন্য আমি কি না করিতে পারি। পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

যুদ্ধ করিয়া, উদ্ধত প্রজাদিগকে কড়া শাসন করিয়া, রাজার হৃদয়ে কোমল ভাবের বড়ই অভাব ছিল। এত স্বার্থত্যাগ কেহ করিতে পারে, তাঁহার কঠিন হৃদয় তাহা বুঝিতে পারিত না।

অতএব খামখেয়ালী রাজা অম্লান-বদনে রাণীকে আজ্ঞা করিলেন, "আচ্ছা, তোমায় পরীক্ষাই করিব। আমার হুকুম, তুমি উলঙ্গ হইয়া এই নগরের সমস্ত পথ ঘুরিয়া আসিবে—দিবাভাগে—কোনরূপ আভরণ লইতে পারিবে না। যাও।"

স্ত্রীলোকের প্রতি—সতী স্ত্রীর প্রতি—সর্ব্বজনবিদিতা রাণীর প্রতি—একি কঠিন আজ্ঞা!

রাণী স্থির করিলেন, রাজার হুকুমই তামিল করিবেন।

"The passions of her mind
Made war upon each other for an hour
Till pity won."

রাণী একজন দূতকে ডাকিয়া তখনই ঢেঁট্রা পিটাইয়া দিতে বলিলেন—'প্রজা সকল, তোমাদের করভার আমি মুক্ত করিবই। রাজা আমাকে কঠিন পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তোমরা সকলেই জননীর সন্তান। আমি তোমাদের জননী। আজ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কেহই তোমরা ঘরের বাহির হইবে না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে ঘরে দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া থাকিবে, পথে দৃষ্টি করিবে না। আমি আজ জগৎকে মাতৃ-স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইব।'

অন্তঃপুরে নিভৃত কক্ষে রাণী ধীরে সমস্ত আভরণ খুলিয়া ফেলিলেন, আজানু-লম্বিত কেশরাশি ঝুলিয়া

পড়িল। এই রমণী-রত্নকে আচ্ছাদন করিয়া রহিল মাত্র এক অপূর্ব্ব সতীত্বের আভরণ।

এই সতীত্বের আভরণে আবৃত হইয়া রাণী ধীর-পদক্ষেপে নিভৃত কক্ষগুলির ভিতর দিয়া ফটকে আসিয়া ঘোড়ায় উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

"Then she rode forth, clothed on with chastity."

জনশূন্য নিঝুম পথ। আকাশে দেবতা অবাক্ হইয়া এই মহিমাময় দৃশ্য দেখিতেছেন। বাতাস যেন নীরব হইয়া ভয়ে ভয়ে বহিতেছে।

"And all the low wind hardly breathed for fear."

সতী চলিয়াছেন। হায় মা, স্বভাব-সুলভা স্ত্রী-লোকের লজ্জা তোমায় কেন ক্লেশ দিতেছে? পথিপার্শ্বে ঐ প্রস্তরমূর্ত্তিগুলিকে তুমি মানুষ মনে করিয়া কেন চমকিয়া উঠিতেছ? পশ্চাতে সহসা কুক্কুরের চীৎকারে তোমার গণ্ডে কেন রক্তিমাভা প্রকাশ পাইতেছে? ঐ ভদ্র ভবনের শতচ্ছিদ্র পথে কেন তুমি লোক-লোচনের

কল্পনা করিয়া কম্পিত হইতেছ ? দেবি, তুমি দেখিতে পাও নাই, তোমার এক কুপুত্র কৌতূহলের বশীভূত হইয়া ঐ ছিদ্রপথে পাপচক্ষু প্রেরণ করিয়াছিল। সতীর এই অপমান ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন নাই, পাপদৃষ্টি পাপকার্য্য করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। *

"So the powers who wait
On noble deeds, cancelled a sense misused."

তুমি নির্ভয়ে চলিয়া যাও মা। তোমার এ অতুল কীর্ত্তি জগতে তোমার প্রত্যেক সন্তান ভক্তি-রসাপ্লুত-নয়নে স্মরণ করিয়া ধন্য হইবে।

রাণী জয়লাভ করিলেন, মূর্খ রাজা হারিলেন। প্রজারা রক্ষা পাইল।

পাঠক, বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" পড়িয়াছ ? দেখিবে, সীতারাম সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর এই প্রকার শাস্তিরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

---

* এই পাষণ্ড ভবিষ্যৎবংশীয়ের নিকট Peeping Tom নামে অভিহিত হইয়াছে।

হ্যামেলিন নগরের যাদুকর

Browning

মানুষ ভগবান্‌কে ডাকে—যখন বিপদে পড়ে। বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইলে আর ভগবান্‌কে মনে থাকে না। দেবতাকে আমরা মানসিক করি—যখন বিপদ্ হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। বিপদ কাটিয়া গেলে, আর দেবতাকে আমরা প্রতিশ্রুত 'মানসিক' দিই না। এই সকল বড়ই দোষাবহ। মনুষ্যত্ব যাহাদের আছে, তাহারা নিজের প্রতিশ্রুত বাক্য সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করে। যদি কথা দেও, কথা রক্ষা করিবে। কথা না রাখিতে পার, কথা দিও না। এ বিষয়ে একটা উপকথা শুন।

জার্ম্মেণীর অন্তঃপাতী হ্যামেলিন নগরে বড়ই ইন্দুরের উৎপাত আরম্ভ হইল। এমন উৎপাতের কথা তোমরা কখনও শুন নাই। ঘরে, রাস্তায়, মাঠে,

ঘাটে এত ইন্দুর হইল যে, তাহাদের জ্বালায় তিষ্ঠান কঠিন। খাদ্যদ্রব্য সব লুঠিয়া খায়, জিনিসপত্র সব নষ্ট করে—মানুষে না পায় খাইতে, না পায় শুইতে। অবশেষে ইন্দুরের জ্বালায় মানুষ পাগল হইবার যোগাড় হইল। দিন-রাত্রি নাই, সময়-অসময় নাই, ইন্দুরের চেঁচামেচির শব্দে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

সে প্রদেশে কি বিড়াল নাই? কুকুর নাই? তাহারা ইন্দুর মারিতে পারে না? দেখ, যেখানে ইন্দুরেরই রাজত্ব, সেখানে বিড়াল-কুকুর নিজেদের প্রাণ-ভয়েই অস্থির। হাজার হাজার ইন্দুরে যদি এক একটা বিড়াল বা কুকুরকে আক্রমণ করে, তবে সে বেচারার কি আর তখন প্রাণরক্ষার উপায় থাকে? সুতরাং এই হ্যামেলিনে বিড়াল-কুকুর আর থাকিল না।

তার পর আরো সর্ব্বনাশ! মানুষের খাদ্য ত থাকিলই না, ইন্দুরগুলা শেষে মানুষের কচি ছেলে মেয়েগুলিকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এখন উপায়?

নগরের মোড়লেরা সভা করিলেন। সহরের

লোকেরা চীৎকার করিতে লাগিল—"তোমরা আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আমাদের খাইয়া তোমরা স্বচ্ছন্দে আছ, এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর।" মোড়লেরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়—কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে না। বৃদ্ধ মোড়ল মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, আর ভাবিলেন, 'আজ বুঝি আমারই বা প্রাণ যায়।'

এমন সময়ে দ্বারে উপস্থিত হইল একজন অদ্ভুত বেশধারী পথিক। নানাবর্ণের কাপড় দিয়া প্রস্তুত তাহার পরিধেয়-বস্ত্র, লম্বা লম্বা চুল, কোটরগত ছোট ছোট চক্ষু, দাড়ি নাই, গোঁপ নাই। এমন বিচিত্র লোক কেহ কখনও দেখে নাই। মোড়ল মহাশয়েরা এই অদ্ভুত ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয় পাইলেন—দিনে-দুপুরে কি শ্মশান হইতে একটা ভূত উঠিয়া আসিল?

সে সটান মোড়ল মহাশয়দের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আমি যাদুকর, আমি অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানি। যত প্রকার পোকা, মাকড়, ইন্দুর, ছুঁচা ইত্যাদি মানুষের অনিষ্টকারী জীব আছে, আমি মন্ত্র

দ্বারা সকলকে নষ্ট করিতে পারি। তোমরা বিশ্বাস যদি না কর, দেখ, আমার কত সার্টিফিকেট আছে—আমি তুর্কীর সুলতানের কাজ করিয়াছি, ভারতবর্ষের নিজামরাজ্যের সমস্ত মশা নষ্ট করিয়াছি। আমি তোমাদের সহরের সকল ইন্দুর ধ্বংস করিয়া দিব। তোমরা স্বীকৃত হও যে আমায় এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা দিবে?"

জলমগ্ন মানুষ তৃণকেও আঁকড়িয়া ধরে। মোড়ল মহাশয়েরা ভাবিলেন, "ক্ষতি কি? প্রাণ থাকিলে তো টাকা?"

এই ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এক হাজার কেন, পঞ্চাশ হাজার দিব, যদি তুমি আমাদের এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পার।"

যাদুকর রাস্তায় নামিলেন, একটা বাঁশী বাহির করিয়া তাহাতে ফুঁ দিলেন, আর আশ্চর্য্য! দূরে শোনা গেল থপ্-থপ্ শব্দ, আর কিচি-মিচি রব। ছোট বড় ইন্দুর কাতারে কাতারে বাহির হইতেছে, রাস্তা ভরিয়া গেল। যাদুকর বাঁশী বাজাইয়া চলিলেন,

ইন্দুরের দল তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। ক্রমেই ইন্দুরের দল বাড়িতে লাগিল। এ রাস্তা, ও রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাদুকর বাঁশী বাজাইয়া চলিল, আর যেখানে যত ইন্দুর ছিল, সব যাদুকরের পিছনে চলিতে লাগিল। সব রাস্তা, অলি-গলি ঘুরিয়া, সব স্থানের সমস্ত ইন্দুর এই প্রকারে জড় করিয়া যাদুকর এই ইন্দুর-বাহিনী লইয়া, নগরের বাহিরে যে খর-স্রোতা নদী ছিল, তথায় উপস্থিত হইল। তখন আর এক অদ্ভুত ব্যাপার আরম্ভ হইল। সমস্ত ইন্দুরগুলি ঝুপ্-ঝাপ্ করিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল ও নদীর প্রবল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল, কত মরিয়া গেল, কত হাঙ্গর-কুমীরে খাইয়া ফেলিল। মাত্র একটা প্রধান ইন্দুর কোন মতে প্রাণ বাঁচাইয়া ওপারে গিয়া উঠিল। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, সে হয়ত তোমাকে বলিতে পারিবে, ইন্দুরগুলা এই যাদুকরের বাঁশী শুনিয়া কেন এমন বোকার মত তাহার পিছনে পিছনে গিয়া প্রাণ হারাইল। হয় ত সে বলিবে, "দেখ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমাদের তাহাই

ঘটিয়াছে। বাঁশীর আওয়াজ যখন প্রথম আমাদের কানে যায়, তখন আমাদের বোধ হইল, কোথায় যেন কত খাবার তৈয়ারী হইতেছে। তাহার ছেঁক-ছোঁক শব্দ আমরা শুনিতেছি। ক্রমে আমাদের মনে হইতে লাগিল, কোথায় যেন কত রাশি রাশি খাবার আঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে, কে যেন আমাদের সেই সকল খাইতে অতি মধুর স্বরে আহ্বান করিতেছে। ক্রমে যেন মনে হইতে লাগিল, এই সমস্ত পৃথিবীটাতে যেন খাবার ছাড়া আর কিছুই নাই। আমাদের দাঁত সুড়সুড় করিতে লাগিল, জিব দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সব ভুলিয়া, এই অভাবনীয় সুযোগ ছাড়া হইবে না ভাবিয়া আমরা ছুটিয়া চলিলাম। নদীর সম্মুখে আসিয়া আমাদের মনে হইতে লাগিল, এই যে চিনি-মিশ্রির রাশি সাজান রহিয়াছে। ভাবিয়াই, আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, তখন দেখিলাম যে, এ তো বেগবান্ স্রোতের মধ্যে পড়িয়াছি। কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, আমি একলাই বাঁচিয়াছি।"

হ্যামেলিনবাসীদিগের আনন্দ দেখে কে? তাহারা মহা আনন্দে ঘরবাড়ী পরিষ্কার আরম্ভ করিয়া দিল; ওদিকে গির্জ্জায় ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। বৃদ্ধ মোড়ল মহাশয় মহা উৎসাহে হুকুম দিলেন, "সব পরিষ্কার কর, ইন্দুরের বাসা খোঁচাইয়া ভাঙ্গ, যেন উহাদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন না থাকে।" মোড়ল মহাশয় ইতস্ততঃ তদারক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় সেই যাদুকর আসিয়া মোড়ল মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত। "মহাশয়, প্রতিশ্রুত এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিন, তার পরে আপনাদের কাজ করিবেন—আমায় এখনই বাগদাদ্ সহরে গিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে।"

মোড়ল মহাশয় ভাবিলেন, কি আপদ্! বলিলেন, "দেখ বাপু, আমরা তো স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সমস্ত ইন্দুরগুলি নদীতে মরিয়াছে। তাহাদের আর ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই। তা এখন আর ভয় কি? তোমাকে কিছু বখ্‌শিস্ দিয়া দিতেছি, তুমি ভাল করিয়া

গাঁজাটাঁজা খাইও। আর হাজার স্বর্ণমুদ্রার কথা যে বলিতেছ, সে কি আর আমরা সত্যি সত্যি দিব মনে করিয়াছিলে? আমরা ঠাট্টা করিয়াছিলাম; আচ্ছা, তোমাকে ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা দিলেই তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।"

যাদুকর ভ্রূকুঞ্চিত করিল। বলিল, "আমার সময় নাই। শীঘ্র আমার টাকা বাহির কর। আমাকে অসন্তুষ্ট করিলে তোমাদের ভাল হইবে না।"

মোড়ল মহাশয় চটিয়া উঠিলেন, "কি, আমার মুখের উপর এত বড় কথা! এখনই বাহির হও, তোমাকে আমরা ভয় করি না।"

যাদুকর আর বাক্যব্যয় না করিয়া রাস্তায় বাহির হইল। আবার একটি বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। আর অমনি, হরি, হরি, হরি, এ কি হইল! সে সহরে যত শিশু ছিল, বালক বালিকা ছিল, সকলে হাততালি দিতে দিতে, নাচিতে নাচিতে দৌড়াইয়া যাদুকরের পশ্চাৎ ছুটিল। কে থামায় তাহাদের? লাফাইয়া, ঝাঁপাইয়া, ছুটিয়া তাহারা

মুহূর্ত্তমধ্যে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া ঐ অদ্ভুত বাদ্য শুনিতে শুনিতে চলিল।

মোড়ল মহাশয় নির্ব্বাক্, নাগরিকগণ হতভম্ব; সকলে চিত্রাপিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, কাহারও নড়িবার শক্তি রহিল না; কেবল বোকার মত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যাদুকর আগে আগে যাইতেছে, আর বালক-বালিকার দল নাচিতে নাচিতে পশ্চাতে চলিয়াছে। তার পর—তার পর—ঐ-ঐ যাদুকর কি নদীর কিনারে যাইতেছে? নাগরিকগণ নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া চাহিয়া আছে; হায়, হায়, এই বুঝি সব শেষ হইল!

যাদুকর নদীর রাস্তা ছাড়িয়া, নগরপ্রান্তে যে পাহাড় আছে, তাহার নিকট উপস্থিত হইল। নাগরিকেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল, এই পাহাড় ডিঙাইয়া আর কোথায় লইয়া যাইবে, এইবার ব্যাটার ফিরিতেই হইবে।

মূর্খ নাগরিকেরা যাহা ভাবে নাই, তাহাই হইল। পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পর্ব্বতগাত্রে দিব্য

এক প্রকাণ্ড দুয়ার খুলিয়া গেল, যাদুকর ও বালক-বালিকার দল সব সেই পর্ব্বতগহ্বরে অদৃশ্য হইল। দুয়ার বন্ধ হইয়া গেল।

দুয়ার বন্ধ হইবার পর-মুহূর্ত্তেই একটিমাত্র বালক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া উপস্থিত, দুয়ার বন্ধ হইল দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীরা যে সুন্দর দেশে বেড়াইতে গিয়াছে, খোঁড়া বলিয়াই ত সে, সে দেশে যাইতে পারিল না। তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে? জীবনে কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। ঐ নগরে মাত্র সেই খোঁড়া বালকটি থাকিল, নতুবা নগর আজ শিশু-শূন্য হইল।

অতঃপর নাগরিকেরা হরিষে বিষাদে কাল কাটাইতে লাগিল। যাহারা গিয়াছে, তাহারা আর ফিরিল না।

মোড়ল মহাশয় এই অপূর্ব্ব ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ঐ পর্ব্বতগাত্রে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন ও ঐ ঘটনার দিন হইতে ঐ নগরে একটি সাল প্রচলিত করিলেন।

কবি তোমাদের এই উপদেশ দিতেছেন যে,—প্রতিজ্ঞা করিবে যাহা, অবশ্য রাখিবে তাহা, মনুষ্যত্ব ইহারেই বলে।

"If we've promised people aught ;
let us keep our promise."

রাজা জন ও ধর্ম্মযাজক

Ballad

ইংলণ্ডের রাজা জন ১১৯৯—১২১৬ খৃঃ অব্দ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি ভীষণ অত্যাচারী রাজা ছিলেন। পরস্বাপহরণ করিতে, প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে, তাঁহার যেন কি একটা সুখ হইত। এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাকে শেষ-জীবনে বিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

এই জনের রাজত্বকালে কাণ্টারবারীর ধর্ম্মযাজক অত্যন্ত ধনবান্ ছিলেন; তিনি রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা একটি মনোরম অট্টালিকায় বাস করিতেন ও তাঁহার বাটীতে রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক দাসদাসী ছিল। লোকমুখে ধর্ম্মযাজকের এইরূপ প্রভূত ধন-

সম্পত্তির কথা শুনিয়া রাজা জনের অত্যন্ত ঈর্ষা হইল। একদিন তিনি ধর্ম্মযাজককে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "শুনিতেছি, আপনি নাকি আমা অপেক্ষাও অধিক জাঁক-জমকে থাকেন; আমার বোধ হয় আপনি অসদুপায়ে অর্থলাভ করিয়া এত ধনী হইয়াছেন।"

ধর্ম্মযাজক এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমি নির্দ্দোষ; আমার যাহা আছে, তাহাই আমি খরচ করি। আমি অসদুপায়লব্ধ টাকা দ্বারা কখনও জাঁকজমক করি না। দোহাই মহারাজ, আপনি আমাকে ধনরত্ন ভোগ করিতে দিবেন ও আমার প্রতি কোনও প্রকার অন্যায় আচরণ করিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "দেখিতেছি, এই ধন-রত্নই আপনার কাল হইবে; কারণ, ইহার জন্য আপনি মরিবেন। এখন আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর আপনাকে দিতে হইবে; যদি উত্তর দিতে অক্ষম হন, তবে আপনার মস্তক আর আপনার দেহে থাকিবে না। প্রশ্ন তিনটি এই:—

(১) এই আমার ধনসম্পত্তি, প্রজাপুঞ্জ, মুকুট ও স্বর্ণ-হীরকাদি লইয়া আমার মূল্য কত, তাহা পেনি পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া বলিতে হইবে।

(২) আমি ঠিক কত সময়ে এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারিব?

(৩) আমি এখানে এই সময়ে কি ভাবিতেছি?"

যাহারা দুষ্ট ও বলশালী, তাহারা অন্য কাহারও সৌভাগ্য দেখিতে পারে না। তাহারা মনে মনে সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। তাহারা যে কোন সূত্রে তাহার অনিষ্ট করিতে ছাড়ে না। রাজা জন এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহা না হইলে কি তিনি বিনা দোষে একজন ধনশালী নিরীহ ধর্ম্মযাজকের প্রতি এরূপ কঠিন দণ্ড আরোপ করিতেন?

যাহা হউক, হতভাগ্য ধর্ম্মযাজক কহিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে তিন সপ্তাহ সময় দিন; আমি সেই সময়ের মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইব।"

রাজা কহিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে। কিন্তু যদি

উত্তর দিতে অক্ষম হন, তবে আপনার সমস্ত সম্পত্তি আমি বাজেয়াপ্ত করিব।” ধর্ম্মযাজক নিরাশহৃদয়ে দুঃখিত-মনে চলিয়া গেলেন, ভাবিলেন, আর রক্ষা নাই।

তিনি অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি সকল জায়গায় গেলেন, কিন্তু তথায় এমন জ্ঞানী লোক কেহ ছিল না যে, এইরূপ তিনটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তিনি নিরাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহার পশুপালকের সহিত দেখা হইল। পশুপালক তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “প্রভু, রাজবাটীতে গিয়া কি আপনার কিছু হইয়াছে? আপনাকে এরূপ বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন?” ধর্ম্মযাজক কহিলেন, “আর খবর, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।” এই বলিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। পশুপালক কহিল, “প্রভু, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু আপনাকে এক কাজ করিতে হইবে—আপনি আমাকে আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ ও ঘোড়াটি দিন; আমি নিজে গিয়া আপনার হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিব।

আরও দেখুন, আমাতে ও আপনাতে এরূপ সৌসাদৃশ্য আছে যে, আপনার পোষাক পরিলে আমাকে ঠিক আপনার মতই দেখাইবে, কেহ চিনিতে পারিবে না। আমাকে ছোটলোক দেখিয়া আমার বাক্যের উপর অনাস্থা স্থাপন করিবেন না।”

এই কথা বলিলে ধর্ম্মযাজক তাহাকে সমুদায় পোষাক পরিচ্ছদ ও ঘোড়াটি দিলেন। পশুপালক তখন উহা পরিল ও ঘোড়ায় চড়িয়া রাজবাটীতে গেল।

রাজা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ধর্ম্মযাজক মহাশয়, আপনি কি উত্তর ঠিক করিয়াছেন? করিয়া থাকেন ত বলুন।” পশুপালক কহিল, “মহারাজ, বলিতেছি, শুনুন। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই :—দেখুন, মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের ত্রয়োদশ শিষ্যের মধ্যে একজন শিষ্য ত্রিশটি মাত্র মুদ্রার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুখ্রীষ্টকে শত্রুহস্তে বিক্রয় করিয়াছিল; কিন্তু আপনি তাহা অপেক্ষাও অধম। আপনার মূল্য উনত্রিশ মুদ্রা, যেহেতু, আপনি উনত্রিশ মুদ্রার লোভেও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আপনি যদি সূর্য্যের সহিত আকাশে উঠেন ও যে পর্য্যন্ত সূর্য্য পুনরায় না উঠে, সেই পর্য্যন্ত সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করিতে থাকেন, তবেই আপনি ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারিবেন।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আপনি আমাকে ক্যাণ্টারবেরীর ধর্ম্মযাজক বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু ভাল করিয়া দেখুন, আমি ধর্ম্মযাজক নহি; আমি তাঁহার অধীন একজন পশুপালক মাত্র। আমি তাঁহার হইয়া এ স্থানে তাঁহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

এই প্রকার সুন্দর উত্তর শুনিয়া রাজা অত্যন্ত খুসী হইয়া কহিলেন, "তোমার উপর আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পদে স্থাপন করিলাম।" পশুপালক তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, মহারাজ, এমন কাজও করিবেন না; কারণ, আমি লিখিতে পড়িতে কিছুই জানি না।" রাজা কহিলেন, "তাহা হইলে, তুমি আমার সহিত যেরূপ রসপূর্ণ কৌতুক করিয়াছ, সেইজন্য

আমি তোমাকে প্রতি সপ্তাহে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা দিব এবং তুমি ধর্ম্মযাজককে গিয়া বল যে, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম।"

পাঠক দেখিতেছ যে—

"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।"

ডোরা

Tennyson

বৃদ্ধ এ্যালান একজন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক। তাহার অনেক জমিজমা আছে, তাহাতে অনেক শস্য হয়। সে নিজে আর কাজে যায় না, লোক খাটায় ও তাহাদের কাজ পরিদর্শন করে। পরিজনমাত্র তাহার পুত্র উইলিয়ম ও তাহার ভাইঝি ডোরা।

ডোরার একটু ইতিহাস আছে। অনেকদিন পূর্ব্বে ডোরার বাপের সঙ্গে এ্যালানের ভয়ানক ঝগড়া হয়। এ্যালানের দরিদ্র ভ্রাতা গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যায়। ভাই নিরুদ্দেশ হইলে পর এ্যালানের চৈতন্য হয়, যে বড়ই অন্যায় করিয়াছে। ভাইএর সঙ্গে আর ইহজীবনে এ্যালানের দেখা হইল না। ডোরাকে নিজগৃহে আনিয়া এ্যালান পালন করিতে লাগিল এবং ভাইএর

প্রতি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছে বলিয়াই যেন ডোরাকে অত্যধিক ভালবাসিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর অনেকদিন গিয়াছে, ডোরা বড় হইয়াছে, উইলিয়মও বড় হইয়াছে। জ্যেঠার সংসারে আসিয়া ডোরা এখন কর্ত্রী হইয়াছে—ডোরা না দেখিলে কোন কাজ হয় না। অতি শান্ত-স্বভাব তাহার—মুখে উচ্চ কথা নাই। বৃদ্ধ এ্যালান তাহাকে ভালবাসে, তাহা সে জানে, কিন্তু আরো জানে, কেন বৃদ্ধ তাহাকে এত ভালবাসে—কারণ, যখন ছোটবেলায় ডোরাকে বৃদ্ধ লইয়া আসে, তখন তাহার জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, তাহার পিতার সহিত বৃদ্ধের যে কলহ হয়, তাহার ফলেই সে নিরাশ্রয় হয় ও জ্যেঠার সংসারে আসে, তাহা সে ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিয়াছিল। এখন ত সে বড়ই হইয়াছে।

এরূপ পিতৃমাতৃহীনার প্রাণে একটা কি যেন বিষাদ থাকারই সম্ভব। সুতরাং ডোরা কথঞ্চিৎ গম্ভীর-প্রকৃতির হইয়া পড়িয়াছিল। কোপনস্বভাব বৃদ্ধ জ্যেঠাকে সে ভয় করিত, সকলেই ভয় করিত।

একদা বৃদ্ধ, পুত্র উইলিয়মকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ,

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তোমাকে বিবাহিত ও সংসারে প্রবিষ্ট দেখিয়া আমি মরিতে চাই। আমার চিরদিনের বাসনা যে, তুমি ডোরাকে বিবাহ কর। যে দিন তাহার পিতাকে তাড়াইয়া দিয়া আমি ঘোর পাপের কাজ করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই এইরূপে পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করিব স্থির করিয়াছি। ডোরার মত স্ত্রী আর কোথাও পাইবে না।"

ইংরেজ-সমাজে খুড়তুতো জ্যাঠ্‌তুতো ভাই বোনে বিবাহ প্রচলিত আছে, পাঠক এরূপ বিবাহ অন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিও না।

উইলিয়ম বৃদ্ধের প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। ডোরার সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে সে খেলিয়াছে, বেড়া-ইয়াছে; ডোরাকে সে বোনের মত ভালবাসে; ডোরার মত নম্র ও ধীর বালিকা সে আর দেখে নাই; ডোরার মত পাকা গৃহিণী পাওয়া দুষ্কর; সে একাই তাহাদের সংসার চালাইতেছে। এ সব সত্য। কিন্তু উইলিয়ম এ বিবাহে নারাজ। সে কোনও দিন এরূপ কথা ভাবে নাই, পিতা জোর করিয়া এই বিবাহ দিতে চাহেন,

তাহাতে সে রাজি নহে। পুত্র পিতার দোষ গুণই পায়। বৃদ্ধ এ্যালানের ক্রোধ ও জিদ্ উইলিয়মে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ছিল। উইলিয়ম বৃদ্ধের প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বসিল।

তার পরে যাহা এরূপ স্থলে ঘটে, তাহাই হইল। বৃদ্ধ পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল; বলিল, "দেখিও, তোমার মত অবাধ্য পুত্রের ছায়াও যেন আর আমায় মাড়াইতে না হয়।"

ক্রোধের বশীভূত হইয়া মানুষে এমন অন্যায় কার্য্য করিয়া বসে যে, পরে তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হয়।

উইলিয়মের ক্রোধটা ডোরার উপরেও গিয়া পড়িল। ডোরার কি দোষ? উইলিয়ম ডোরার উপর চটিয়া গিয়া প্রত্যেক কথায় ও কার্য্যে তাহাকে অপমান করিত ও কাঁদাইত। উইলিয়মকে বৃদ্ধ একমাস সময় দিয়াছিল, যদি ইতিমধ্যে পিতার কথামত কার্য্য করে। উইলিয়মের জিদ্ কমিল না, বরং জিদের বশে সে ঐ গ্রামস্থ মেরী মরিসন্ নাম্নী এক কৃষক-কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। অতঃপর উইলিয়ম ঐ গ্রামেই

সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিল। মজুরী খাটিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ কঠোর হইতে কঠোরতর হইল। উইলিয়মের বিবাহ যে দিন হয়, সে দিন ডোরাকে ডাকিয়া বৃদ্ধ আজ্ঞা করিল, "তোমাকে আমি আপন কন্যারূপে পালন করিয়াছি। তুমি আমার অবাধ্য হইতে পারিবে না। আমি যাহা বলি, মন দিয়া শুন। আমার অবাধ্য পুত্রের সহিত যদি তুমি কোনও সম্বন্ধ রাখ, এমন কি, যদি তাহার সঙ্গে বাক্যালাপও কর, তাহা হইলে তোমাকেও আমার গৃহ-ত্যাগ করিতে হইবে। সাবধান, আমার আজ্ঞা অটল।"

ডোরা অবনতবদনে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধের আজ্ঞা মানিয়া লইল। ভাবিল, জ্যেঠামহাশয় কালে কোমল হইবেন, এখন নয় তাঁহার কথাতেই সায় দিলাম।

উইলিয়ম ডোরার উপরও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, অনেক কটু কথাও বলিয়াছিল, নীরবে ডোরা সব সহ্য করিয়া গিয়াছে, ডোরার জীবন যেন নীরবে সহ্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল।

দিন যায়। উইলিয়মের অবস্থা শোচনীয় হইয়া

দাঁড়াইল। কাজ পায় না, অন্ন জোটে না। তদুপরি একটি শিশু-সন্তান হইলে পর আরো অনটন হইতে লাগিল। ম্লানমুখে উইলিয়ম পিতার গৃহের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, পিতা তাহার দুরবস্থা দেখিয়াও দেখিল না, দুঃসময়ে কোন সাহায্যও করিল না।

কেবল ডোরা এই দুঃসময়ে যাহা পারিল, তাহা করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। সংসার হইতে দ্রব্যাদি কিছু কিছু বাঁচাইয়া লুকাইয়া উইলিয়মের গৃহে দিয়া আসিত, উইলিয়ম বা মেরী তাহা জানিতেও পারিত না।

অবশেষে হঠাৎ একদিন উইলিয়ম সামান্য জ্বরে মরিয়া গেল। বিধবা মেরী দুগ্ধপোষ্য শিশু লইয়া অকূল পাথারে পড়িল। এই শিশুকে কি খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিবে—উইলিয়ম তো কিছু রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

ডোরা চুপে চুপে তাহাদের সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, মেরীও তাহা জানিত না। সুতরাং ডোরার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন কারণ তাহার নাই। বরং ডোরার প্রতি তাহার আক্রোশ হওয়ারই প্রভূত কারণ

বর্ত্তমান ছিল। এই ডোরাকে বিবাহ না করাতেই তো উইলিয়ম পিতার বিরাগভাজন হইয়া অবশেষে অন্ন-চিন্তায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। এইজন্য উইলিয়মের মৃত্যুর পর যখন ডোরা মেরীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন মেরী বড় প্রীত হইল না। মেরী তখন ছেলে কোলে করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল। ডোরা বলিল, "এতদিন আমি জ্যাঠামহাশয়ের আজ্ঞা পালন করিয়াছি, কিন্তু আর পারি না। আমি হতভাগিনী, আমার জন্যই উইলিয়মের সহিত পিতার মনোমালিন্য হয়। হায়, এমন হইল যে, উইলিয়ম আর বাঁচিলই না। কিন্তু এখন আমি আমার কর্ত্তব্য না করিয়া আর থাকিতে পারি না, উইলিয়ম তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তোমার প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে। আমি আজ যাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহাতে আমার যাহা হউক, স্বর্গে উইলিয়মের আত্মা দেখিয়া প্রীত হইবে।"

এই বলিয়া ডোরা তাহার প্রস্তাব বিবৃত করিল। বৃদ্ধ এ্যালানকে বশীভূত করিয়া পৌত্রকে গ্রহণ করাইতে হইবে। এবার মাঠে অত্যধিক ফসল হইয়াছে। বৃদ্ধের

মনটাও ভাল আছে। বৃদ্ধ যখন ফসল দেখিতে মাঠে যাইবে, সেই সময় ডোরা শিশুটিকে লইয়া বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইবে। আজ পুত্র নাই, বৃদ্ধ কি পৌত্রের স্নেহ এড়াইতে পারিবে? ডোরা খোকাকে লইয়া মাঠে গেল। শস্যক্ষেত্রের মাঝে একটু পরিষ্কার স্থান দেখিয়া তথায় খোকাকে লইয়া বসিয়া রহিল। যথাসময়ে বৃদ্ধ ক্ষেত্র-পরিদর্শনে আসিল। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, মজুরেরা শস্য কাটিয়া স্তূপ দিতেছে। কিন্তু ডোরা যে দিকে আছে, বৃদ্ধ সে দিকে গেল না। ডোরা ভাবিতে লাগিল, কি করি, খোকাকে লইয়া বৃদ্ধের সম্মুখে যাই, কিন্তু উঠিতে পারিল না। তাহার ভয় করিতে লাগিল। মাঠের মজুরেরা সকলে ডোরাকে চিনিত, ডোরার ক্রোড়স্থিত শিশু কে, তাহাও জানিত, ডোরা কেন মাঠে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে তাহাও জানিত, কিন্তু সাহস করিয়া কেহই এ্যালানকে বলিতে পারিল না। উঠি উঠি করিয়া ডোরা কয়বার চেষ্টা করিল, সাহসে কুলাইল না। এ্যালান চলিয়া গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হইল।

"And the reapers reaped,
And the sun fell, and all the land was dark."

পরদিন প্রাতে ডোরা ভাবিল, আজ সাহস করিবই। খোকাকে লইয়া পুনরায় শস্যক্ষেত্রে গিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল, বনফুল লইয়া দিব্য সুন্দর মালা তৈয়ারী করিয়া খোকাকে সাজাইল। যেন বৃদ্ধ এই সুন্দর শিশুকে দেখিয়া না ভুলিয়া থাকিতে না পারে। বৃদ্ধ আজ মাঠে আসিয়া অনতিবিলম্বেই দূরে ডোরাকে এইরূপ বিব্রত দেখিয়া কাজ ফেলিয়া তথায় আসিয়া ডোরাকে প্রশ্ন করিল, "তোমাকে কা'ল সারাদিন দেখি নাই, কোথায় ছিলে? এ কাহার ছেলে? আর এখানেই বা কি করিতেছ?" ডোরা সাহসে ভর করিয়া নীচুমুখে উত্তর দিল, "এইটি উইলিয়মের ছেলে।"

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল, ক্রোধস্বরে বলিল, "কি! তোমায় না আমি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম? আমার কথা অমান্য করিয়াছ!"

ডোরা পূর্ব্ববৎ ধীরে উত্তর করিল, "আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, ক্ষতি নাই। কিন্তু আপনার পুত্র স্বর্গে

গিয়াছে। তাহার এই শিশুটির প্রতি আপনি নির্দ্দয় হইবেন না। আপনার এই পৌত্রটিকে গ্রহণ করুন।”

বৃদ্ধ আরো ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন, “আমার কি করা উচিত, তাহা শিখাইতে আসিয়াছ? তোমরা দুজন স্ত্রীলোক মিলিয়া ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছ। তুমি আমার কথার অবাধ্য হইয়াছ। তোমার মুখদর্শন আর করিব না। তবে এই শিশুকে আমি গ্রহণ করিলাম।”

বৃদ্ধ শিশুকে কেন গ্রহণ করিল, কে বলিবে? শিশু কিন্তু এই বৃদ্ধকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ তাহাকে কোলে লইলে পর সে চেঁচাইতে লাগিল, কোল হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিল, বনফুলের মালা ছিঁড়িয়া ডোরার পদপ্রান্তে পড়িল। বৃদ্ধ রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া চলিয়া গেল।

ডোরা তথায় বসিয়া পড়িয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। আজ সেও উইলিয়মের মত বিতাড়িত। দূরে খোকার চীৎকার শুনা যাইতেছে—ক্রমে সে শব্দ বিলীন হইল—ডোরা অশ্রুজলে ভাসিয়া নিজের হতভাগ্য জীবনের কাহিনী ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ডোরা উঠিয়া মেরীর গৃহাভিমুখে ধীরে প্রস্থান করিল।

"And the reapers reaped,
And the sun fell, and all the land was dark."

মেরী ছুটিয়া আসিল, দেখিল, ডোরা একলা আসিয়াছে, খোকা নাই। ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "বল ডোরা, ভগবান্ কি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন? বৃদ্ধ এ্যালান্ কি খোকাকে গ্রহণ করিয়াছেন?"

ডোরা বলিল, "হাঁ। কিন্তু মেরী, তিনি আমার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়াছেন, তোমার সহিত আমি থাকিতে চাই। আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া খাইব।"

মেরী মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিল, "না ডোরা, তা হইতে পারে না। তুমি আমার অদৃষ্টের দোষে কেন দুঃখ পাইবে? আর দেখ, এখন আমার মনে হইতেছে, আমার পুত্রকে তাহার পিতামহের নিকট দেওয়া ভাল হয় নাই। কঠোর-হৃদয় সেই বৃদ্ধ আমার ছেলেকে শিখাইবে যে, আমি তাহার মাতা নহি। আমি

কি শেষে পুত্রের স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইব? কাজ নাই আমার ছেলের স্বচ্ছন্দে থাকায়। এস, আমরা দুজনে গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসি। আমরা দুজনে মিলিয়া উইলিয়মের পুত্রকে কি পালন করিয়া উঠিতে পারিব না? বড় হইয়া সে আমাদের দুঃখ ঘুচাইবে।”

ডোরার উদার হৃদয় মেরীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাই মেরী মৃত উইলিয়মের দোহাই দিয়া বলিতে পারিল যে, ডোরার সঙ্গে সে বাস করিয়া তাহার মৃতপতির চিহ্নস্বরূপ এই পুত্রকে পালন করিবার চেষ্টা করিবে। পাঠক, মনে রাখিও, এই মেরীই পূর্ব্ব-দিন হৃদয়ে ডোরার প্রতি আক্রোশ পোষণ করিতেছিল। স্বার্থত্যাগে পৃথিবীতে কে না বশীভূত হয়?

তখন দুজনে এ্যালানের গৃহাভিমুখে চলিল। আজ তাহাদের হৃদয় একতন্ত্রীতে গাঁথা। ভগবান্ তাহাদের ভরসা।

দুয়ার ভেজান ছিল, বন্ধ ছিল না। তাহারা দেখিল, বৃদ্ধ এ্যালান পৌত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া দিব্য

খেলা দিতেছে। কি আশ্চর্য্য! যেন কতকাল এই শিশুর সঙ্গে খেলিয়া আসিয়াছে। শিশুটিও সব ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধের ঘড়ির চেন লইয়া যেন খেলিতেছে, যেন তাহারা কত পুরাতন বন্ধু। এই সংসার কি বিচিত্র মায়ার লীলা!

বৃদ্ধ দুয়ারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া ছিল। মেরী ও ডোরা কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র, শিশুটি মাতাকে দেখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। এ্যালান ফিরিয়া দেখিয়া অমনি শিশুটিকে নামাইয়া দিল। মেরী অগ্রসর হইয়া বলিল, "পিতা—"জানি না, এতদিনের পর এই পিতা সম্বোধনে বৃদ্ধের প্রাণে কি তুফান আনয়ন করিল। মেরী কহিল, "আপনাকে পিতা সম্বোধন করিতেছি, দোষ হইলে ক্ষমা করিবেন। আমি এতাবৎ কখনও নিজের জন্য বা উইলিয়মের জন্য বা এই শিশুর জন্য কোন ভিক্ষা করিতে আসি নাই। কিন্তু আজ আমি সাহস করিয়া আসিয়াছি। আমাকে এক ভিক্ষা দান করিতে হইবে।"

একটু থামিয়া পুনরায় মেরী বলিল, "আপনি ডোরাকে ডাকিয়া লউন, সে কোন দোষ করে নাই। আপনাকে সে ভালবাসে। আপনি এরূপ স্নেহময় হৃদয়

কোথায় আর পাইবেন? আর দ্বিতীয় কথা, দেখুন, আপনার পুত্র মৃত্যুকালে নিজের পাপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া গিয়াছে—বলিয়া গিয়াছে যে, আপনার অবাধ্য হইয়া সে অপকর্ম্ম করিয়াছে। ভগবান্ যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। অনুতপ্ত উইলিয়মের প্রতি আর কেন কঠোর হইবেন? তাহার পুত্রকে আমায় প্রত্যর্পণ করুন। হয় তো বা আপনি এই শিশুকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি দ্বেষ করিতে শিক্ষা দিবেন। তাহার আবশ্যকতা কি? মৃত উইলিয়ম শান্তি প্রার্থনা করিয়া মরিয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমার ছেলেকে ফিরাইয়া দিন ও ডোরাকে গ্রহণ করুন।”

মেরী বক্তব্য শেষ করিলে পর, ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ থাকিল। ডোরা দুহাতে মুখ ঢাকিয়া মেরীর নিকট দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কি ভাবিতেছে?

সহসা বৃদ্ধ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতদিনে পাষাণ গলিল।

বিগলিত-হৃদয় বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, “হায় হতভাগ্য আমি, নিজের পুত্রকে মারিয়াছি। কিন্তু আমি যে তাকে

বড় ভালবাসিতাম। হায়, ভগবান্! আমি কি করিতে কি করিয়াছি! আয় বাছারা, তোরা আমার কোলে আয়।"

তার পর পাঠক "ভিত অশ্রুনীরে"। তিনজনে গলা জড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া উইলিয়মকে স্মরণ করিয়া কাঁদিল। অশ্রুধারা আজ এই তিন জনের প্রাণে শান্তি সেচন করিল।

আর কি চাই' পাঠক? স্নেহের পুত্তলীকে আশ্রয় করিয়া এই তিনটি প্রাণী কালাতিপাত করিতে লাগিল, ইহা বলিলেই কি যথেষ্ট হইবে না? ডোরার জীবনে আর কোন কি পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে পার?

"Dora lived unmarried till her death."

কিন্তু পাঠক, ডোরার উচ্চ প্রাণ কি মেরীতে সম্ভবে? তাই কবি উপসংহারে বলিয়াছেন—

"And as years
Went forward, Mary took another mate."

মুলেখা

Browning

আরবীয়ের নিকট তাহার অশ্ব অতি প্রিয় বস্তু—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। এই সম্বন্ধে সুন্দর একটি গল্প বলিতেছি, শুন।

হোসেন একজন গরীব আরব। তাহার বাপের অনেক সম্পত্তি ছিল, কিন্তু আরবীয়ের সম্পত্তি বড়ই ক্ষণকালস্থায়ী। হোসেন যে দলের লোক ছিল, সেই দলের লোকেরা কোন একটা খুন করে, সেই দায়ে সমস্ত দলকে শাস্তি দেওয়া হয়—তাহাদের সকলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এখন হোসেনের থাকিল মাত্র একখানি বস্ত্রাবাস ও হাজার রাজার ধনতুল্য একটি ঘোড়া—মুলেখা।

হোসেন দরিদ্র, সব হারাইয়াছে, কিন্তু দুঃখ কি? বিধাতা দেন, তিনিই লইয়াছেন।

"God gave them, let them go."

সান্ত্বনার মধ্যে আছে মাত্র মুলেখা। ইহাই তাহার ধন, তাহার মাণিক, ইহার কাছে জমিজমা টাকাকড়ি অতি তুচ্ছ।

"You are my prize, my Pearl : I laugh
at man's land and gold."

এইরূপে মুলেখার গর্ব্বে অতি গর্ব্বিত হোসেন। দৌড়ে মুলেখা সকল ঘোড়াকে হারাইয়াছে, তাহার মত বেগবান্ অশ্ব আর দেখি নাই, ইহার জুড়ি আর ছিল না। সমকক্ষ আর ছিল না বটে, তবে মুলেখার সঙ্গী আর একটি অশ্ব ছিল,—তাহারই সহোদর,—অতএব গুণে নিতান্ত কম নহে। ইহার নাম বহেমা। ইহারও প্রভু ছিল হোসেন।

নিঃস্ব হোসেন এইরূপে ভাগ্যবান্ বলিয়া খ্যাত ছিল।

বড়লোকের ছেলে ডুল—এই মুলেখা লাভ করিবার জন্য তাহার প্রবল বাসনা জন্মিল। ডুল হোসেনের আবাসে আসিয়া অতি বিনীতভাবে কহিল,"দেখ হোসেন, শুনিয়াছি, এক শত উষ্ট্র দিলেও তোমার মুলেখার দাম হয় না। আমি

হাজার উষ্ট্র তোমায় দিব। তুমি আমায় তোমার মুলেথাকে দাও, তুমি যে জন্য নিঃস্ব হইয়াছ, সব আমি জানি। আমি বড় লোক, তোমার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেছি।”

ধন থাকিলেই কি বড় লোক হয়? হোসেন বলিল—তাহার অভিমান ন্যায়সঙ্গত—“তোমার অনেক উষ্ট্র আছে, অনেক ধন আছে। তোমার তৃপ্তির অভাব নাই সত্য। তবে আমার মনে হয়, এক মুলেথাকে ভাল-বাসিয়া আমি তোমা অপেক্ষা অনেক ধনী। যাও।”

তুল নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বাসনা ছাড়িল না। আবার কিছুদিন পরে নূতন রকমের ফন্দি করিয়া আসিয়া বলিল, “দেখ হোসেন, তুমি অতি মহৎ লোক। তোমার নিকট মুলেথার বেচাকেনার কথা বলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। এখন আমি তোমার দয়ার প্রার্থী। মুলেথার জন্য আমার পুত্র পাগল হইয়া গিয়াছে, উন্মাদ তাহার শরীরকে মাটী করিয়া ফেলিয়াছে, সে মরিতে বসিয়াছে। তুমি মুলেথাকে দিয়া আমার পুত্রের প্রাণ বাঁচাও—তাহার এ বিষম ব্যাধি আর কোন উপায়ে সারাইতে পারা যাইবে না। দোহাই হোসেন, রক্ষা

কর। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন। ভগবানের নামে দান করিলে তাহা বস্তুতঃ নষ্ট হয় না। পর-জন্মে তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

"—Be God the rewarder, since
God pays debts seven for one ; who squanders on Him shows thrift."

স্বার্থপর লোকে নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইরূপই ধর্ম্মের দোহাই দেয়। হোসেন তুলের স্বার্থপরতা বুঝিল, কহিল, "তোমার পুত্র অবশ্য তোমার বড়ই প্রিয়। তাহারই জীবনরক্ষার জন্য তুমি এই প্রস্তাব করিতেছ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমার প্রাণের মুলেখা যদি মরিতে বসে, আমি কি তোমার পুত্রকে ভিক্ষা করিয়া আনিতে যাইব? তুমি মূর্খ, জান না, মুলেখা আমার জীবন? যাও।"

কিছু দিন যায়। তুল ভাবিল, এবার আর সে মুলেখাকে ভিক্ষা করিতে যাইবে না। "কি! এত আস্পর্দ্ধা! কোথাকার হোসেন, পেটে অন্ন জোটে না, আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি কবুল করিলাম, হতভাগা আমায়

টিট্‌কারী দিয়া তাড়াইল! আবার ব্যাটা এদিকে লোকের কাছে নিজের মহত্ত্ব দেখায়—নিজে খাইতে পায় না, নিজের যাহা কিছু অন্যকে খাওয়ায়, নিজের পরিধানের বস্ত্র প্রার্থীকে দান করে, আমার স্ত্রীর যেমন দুর্ব্বুদ্ধি, ব্যাটা ভণ্ডের কাছে আমায় ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিল। আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে পর্য্যন্ত এই পাষণ্ডের ঘোড়া আমি না হস্তগত করিতে পারি, তত দিন আমি আমার মস্তক প্রক্ষালন করিব না। বলপ্রয়োগ করিব —না, চুরিই করিব। আবশ্যক হইলে হোসেনের প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত করিব। এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

এই প্রকারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দুল একদিন গভীর-রাত্রে চোরের মত হোসেনের আবাসে উপস্থিত হইল।

হোসেন তাঁবুর ভিতর নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে-ছিল। নিশ্চিন্ত হইবার বন্দোবস্তও সে করিয়াছিল। সে মুলেখার মুখের লাগাম ত্রিগ্রন্থি করিয়া নিজের হাতের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া শয়ন করিত, যেন মুলেখাকে কেহ সরাইতে আসিলেই তাহার হাতে টান পড়ে। অধিকন্তু পাশেই বুহেমা জিন-লাগাম সহিত সজ্জিত থাকিত, যেন

কেহ মুলেখাকে তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিতে পারিলেও সে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় অশ্বের উপর অবিলম্বে আরোহণ করিয়া চোরের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে। প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় অশ্বের জন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া হোসেন নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিল।

হুল তাঁবুর ছিদ্র দিয়া সব দেখিল—ভাবিল, তাহার স্বার্থসিদ্ধি সহজ নহে, কিন্তু সাহস না করিলে কি কিছু লাভ হয়? একবার ইহার উপর চড়িয়া বসিতে পারিলেই অশ্ব লইয়া পলাইতে পারিবে। এই অশ্বোত্তমের জন্য এইটুকু সাহস না করিলে চলিবে কেন?

অতি সন্তর্পণে তাঁবুর দুয়ার খুলিয়া হুল প্রবেশ করিল, মুলেখার পৃষ্ঠে জিন চড়াইল, পরে হোসেনের হস্ত-স্থিত লাগামের অংশটুকু ছুরী দিয়া কাটিয়া ফেলিল, হাতের অংশ হাতেই গ্রন্থিযুক্ত রহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মুলে-খার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিল ও তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

চক্ষুর নিমিষে হোসেন লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল,—তাহার হৃদয় ছাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু বুদ্ধি হারাইল না।

মুহূর্ত্তমধ্যে সেও দ্বিতীয় অশ্ব বুহেমার পৃষ্ঠে চড়িয়া বিদ্যুদ্‌-বেগে চোরের অনুধাবন করিল।

গভীর নিশীথে আরব-ভূমির উপর এ কি অপূর্ব্ব ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। সম্মুখে পলায়নপর ভীত দুল অশ্বশ্রেষ্ঠের আরোহী, কিন্তু পটু আরোহী নহে, অথবা এ অবস্থায় হইতেও পারে না। পশ্চাতে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হোসেন অশ্ব-পরিচালনে পটু ও তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অশ্বের উদ্ধারবাসনায় ধাবমান। পাঠক, এই অদ্ভুত দৃশ্য কল্পনা কর। ছুট্—ছুট্—ছুট্! হোসেন বুহেমাকে ক্ষিপ্রগতিতে চালাইতেছে—বুহেমাও যেন বুঝিয়াছে, আজ তাহার জয় কি পরাজয় স্থির হইবে, সুতরাং সে প্রাণপণে ছুটিয়াছে। ওদিকে মুলেখা ভাবিতেছে, "এ কোথায় যাইতেছি? আমার পৃষ্ঠে তো আমার প্রভু নহে। এ কে, আমায় চালাইতে পারিতেছে না—নতুবা আমায় পায় কে?" সুতরাং মুলেখা তেমন দৌড়িতেছে না। বুহেমা অনেক কাছাই-য়াছে—প্রায় ধরিল—আর কয়েক হাত মাত্র বাকী—এই প্রায় বুহেমার নাক মুলেখার পুচ্ছ স্পর্শ করিল।

হায়, আজ কি অদ্বিতীয় মুলেখা হারিবে? তাহার গৌরব কি জন্মের মত ক্ষুণ্ণ হইবে? বেগে অপরাজেয় এই অশ্বকে আজ কি হোসেন তুচ্ছ এক চোরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া চির-লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া ফেলিবে? হোসেন চালিত করিলে কি তাহার আদরের ও গর্ব্বের মুলেখাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে?

সহসা হোসেন চীৎকার করিয়া পলায়নপর তুলকে বলিয়া উঠিল, "রে মূর্খ তুল, মুলেখাকে কি প্রকারে চালাইতে হয়, তা জানিস্ না। উহার দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ কর্ ও বামদিকে পা দিয়া আঘাত কর্।"

হায়, হোসেন এ কি করিল? শক্রকে মুলেখা-চালনের গুপ্ত ইঙ্গিত বলিয়া দিল! তুল অবিলম্বে যথা-বিহিত করিয়া অশ্বচালনা করিল। আর মুলেখা, তুমি এ কি করিলে? প্রভুর মুখের বাণী শুনিতে পাইয়া ও প্রভুর ইঙ্গিত অনুভব করিয়া কি তুমি বুঝিলে যে, তোমায় আজ বিজয়ের দৌড় দিতে হইবে? মুলেখা মুহূর্ত্তমধ্যে হোসেনকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া দূরে অন্তর্হিত হইল।

হোসেন আর ঘোড়া ছুটাইল না। ছলছলনেত্রে

অনেকক্ষণ ধরিয়া দূরে অদৃশ্যমান মুলেখাকে দেখিতে লাগিল। পরে ঘোড়ার মুখ বাড়ীর দিকে ফিরাইল, ধীরে বুহেমা তাহাকে লইয়া চলিল। হোসেন ফুকারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল।

তাঁবুর ভিতর মাটীর উপর বসিয়া হোসেন কাঁদিতেছে—প্রতিবেশীরা আসিল। হোসেন চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে আনুপূর্ব্বিক কাহিনী বিবৃত করিল। প্রতিবেশীরা তাহাকে গালি দিল—"বালকের অপেক্ষাও মূঢ় সে। কেন সে শত্রুকে সঙ্কেত বলিয়া দিতে গেল? এমন নির্ব্বোধ কেহ আছে যে নিজের অনিষ্ট নিজে করে—তা আবার জানিয়া শুনিয়া?"

"To have simply held the tongue were a
task for a boy or girl."

তা তাহারা বুঝিবে কি? হোসেনের প্রাণ জানে কেন সে তাহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, তাহার প্রাণাধিক, তাহার বুকের ধন মুলেখাকে হারাইয়াছে!

"The child of his heart by day, the wife
of his breast by night."

মুলেখাকে কি সে হারিতে দিতে পারে ?

"And the beaten in speed !" wept Hosein :
"you never have loved my Pearl."

মূর্খ প্রতিবেশীরা হৃদয়ের গভীর এই মর্ম্ম বুঝিবে কি করিয়া ?

বৃদ্ধ নাবিক

Coleridge

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়। তাহার পূর্ব্বে লোকে জানিত যে, পৃথিবীটা মাত্র ইয়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার খানিকটা লইয়া। ষোড়শ শতাব্দীতে কলোম্বাস প্রভৃতি বহু উৎসাহী লোক চারিদিকে সমুদ্রযাত্রা করিয়া নানা স্থান আবিষ্কার করেন। এই বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর আর কোন অংশ অনাবিষ্কৃত নাই বলিলেই চলে। উত্তর ও দক্ষিণমেরু দেশ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে যখন লোকে সমুদ্রযাত্রা করিত, তখন তাহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না যে, কোথায় গিয়া পড়িবে। এই সকল পূর্ব্বকালীন নাবিকেরা সমুদ্র বাহিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে গিয়া পৌঁছিত

ও সমুদ্রপথে অভিনব বস্তু সকল দেখিয়া চমৎকৃত হইত। তাহাদের জ্ঞান তখন তত বিস্তৃত ছিল না, সুতরাং তাহারা কল্পনাশক্তির আশ্রয় লইয়াই এই সকল অভিনব বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিত।

পূর্ব্বকালের এইরূপ সমুদ্রযাত্রার একটা অত্যদ্ভুত বিবরণ ইংরাজ কবি লিখিয়া গিয়াছেন। গল্পটি অবশ্য কাল্পনিক, কিন্তু সরলবিশ্বাসী লোকের নিকট এখনও তাহা চিত্তাকর্ষক। এই গল্প নিম্নে বলিতেছি, মন দিয়া শুন।

ইংলণ্ডের কোন স্থানে এক বাটীতে বিবাহ-উৎসব হইতেছে। গীতবাদ্য চলিতেছে, আলোকমালায় সব সজ্জিত, অভ্যাগতে আসর সব ভরপূর।

তিন জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এই বাটীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখেন যে, পক্কশ্মশ্রু উজ্জ্বলচক্ষু একজন বৃদ্ধ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাহার চেহারা দেখিয়া স্বতঃই যেন কেমন ভয় হয়। চক্ষে তাহার অস্বাভাবিক একটা জ্যোতিঃ, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু

বক্ষোদেশ আচ্ছাদন করিয়াছে, হস্ত-পদ জীর্ণ-শীর্ণ, বার্দ্ধক্য সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু শরীরে যেন কি এক অদ্ভুত তেজ। এই ব্যক্তিই আমাদের বৃদ্ধ নাবিক।

ভদ্রলোক তিনটি বরযাত্র। তাঁহারা বরের বাড়ী প্রবেশ করিতে গিয়াই সম্মুখে এই বৃদ্ধ নাবিককে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—এ কি জ্বালা! ব্যাটা চায় কি? ইহাকে দেখিয়া যেন গা শিহরিয়া উঠে!

বৃদ্ধ নাবিক উজ্জ্বল চক্ষু দুটি এই তিন জনের উপর স্থাপন করিয়া একজনকে বাছিয়া লইল। পরে তাহার হাত ধরিয়া হড়্-হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া অদূরে একটা পাথরের উপরে বসিয়া বলিতে লাগিল, "শুন, আমার কাহিনী শুন—আমরা—"

বেচারা বরযাত্র একলা, অন্য দুই জন এই সুযোগ পাইয়া বাটীর ভিতর গিয়াছে, এই তৃতীয় ব্যক্তি এ কি জঞ্জালে পড়িল! সে হাত ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হরি হরি, এ কি! সে তো জোর করিয়াও হাত ছাড়াইতে পারিল না। বৃদ্ধ তাহাকে যাদু করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার আর নড়িবার শক্তি নাই। এই বৃদ্ধ

নাবিকের প্রখর দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। বেচারা ফ্যাল্-ফ্যাল্ নেত্রে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বাক্‌শক্তি যেন চলিয়া গিয়াছে। হতভাগা বাধ্য হইয়া বৃদ্ধের কাহিনী শুনিতে লাগিল। বিবাহের নিমন্ত্রণ ভাসিয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল,—"আমরা জাহাজে চড়িয়া রওনা হইলাম। ক্রমে আমাদের জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া সমুদ্রে পড়িল, সমুদ্র বাহিয়া আমাদের পোত দিবারাত্র দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিল। ক্রমে আমরা বিষুব-রেখা পার হইয়া গেলাম। এ পর্য্যন্ত অনুকূল বায়ু আমাদের পোতকে সুপথে চালাইতেছিল, কিন্তু বিষুব-রেখা পার হওয়ার পর আমাদের ভাগ্য অপ্রসন্ন হইল। কোথা হইতে ভয়ানক এক ঝড় আসিয়া বেগে আমা-দিগকে আরো দক্ষিণে খেদাইয়া লইয়া চলিল। মাস্তুল প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, পালগুলি প্রায় ছিঁড়িয়া যায়—কি সে ঝড়ের বেগ! আমরা প্রমাদ গণিলাম। কোথায় যাইতেছি, তাহার ঠিকানা নাই—এ কোন্ অজানা সমুদ্রে গিয়া আমরা পড়িলাম! ক্রমে আমাদের অবস্থা ভীষণ

হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িল—সুদূর দক্ষিণ-সমুদ্রে এমন স্থানে পড়িলাম, যেখানে বরফ আর কুয়াসা ছাড়া আর কিছুই নাই। ভয়ানক শীত—আর চারিধারে সব সাদা। তুষার-পর্ব্বত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মধ্যে আমাদের জাহাজ কি অদ্ভুত জীব বলিয়াই প্রতিভাত হইতে লাগিল। আর তো কোন দিকে কোন জীবন্ত পদার্থের সাড়া-শব্দ নাই—সেই বরফের দেশে শুধু বরফ—বরফ—বরফ, এবং তাহারই ঘাত-প্রতিঘাত-ধ্বনি। এমন ভয়ানক অথচ মহিমাময় দৃশ্য দেখিয়াছ?

আর আমাদের অবস্থা ভাব। এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি? আমাদের কি হইবে? এ বরফরাশির মধ্য হইতে কি আমরা বাহির হইতে পারিব? এখনই তো বুঝি বরফের চাপে আমাদের জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে?

নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আমরা পরকালের কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে এই নির্জ্জন পারাবারে ভগবানের করুণারূপী একটি এ্যাল্ব্যাট্রস পক্ষী কুয়াসা ও

বরফ ভেদ করিয়া আমাদের জাহাজে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। আজ এই জলার পক্ষীকে পাইয়াই হতাশের আশার সঞ্চার হইল। কত যত্নে আমরা সেই পক্ষীকে নানা খাদ্যদ্রব্য দিলাম। আর আশ্চর্য্য দেখ, ইহার পরেই অমানুষিক ভীষণ শব্দে সম্মুখের বরফ-পাহাড় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, জাহাজের রাস্তা বাহির হইয়া পড়িল—সেই পথে অবিলম্বে আমরা জাহাজ চালাইয়া দিলাম।

আবার অনুকূল পবন বহিল। দিবারাত্র আমরা জাহাজ চালাইলাম। সেই শুভকরী পক্ষী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, যখনি ডাকিতাম, তখনি আসিত, আমাদের হাত হইতে খাদ্য লইয়া নির্ভয়ে খাইত। নয় দিন এই প্রকারে আমাদের সহযাত্রী হইয়া পক্ষীটি আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তার পর—"

বৃদ্ধ নাবিকের মুখ, চোখ, নাক হঠাৎ ভয়ানক বিকৃত ভাব ধারণ করিল। বরযাত্র ভাবিলেন, বুঝি বা ইহার ধনুষ্টঙ্কার হইল। ত্রস্তে বলিয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে, কি হয়েছে?"

বৃদ্ধ নাবিক বিকৃত-কণ্ঠে উত্তর করিল, "না না, কিছু হয় নাই—শুধু এই যে, আমি তীর দিয়া সেই পক্ষিশ্রেষ্ঠকে মারিয়া ফেলিলাম।"

বৃদ্ধ ক্ষণেক থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "নির্জ্জন সমুদ্রে এই একমাত্র সহচর আমরা পাইয়াছিলাম—তাহাকে বধ করিয়া ফেলিলাম, এই পক্ষীই আমাদিগকে যেন ত্রাণ করিয়াছিল—বরফ-সমুদ্রে পথ বাহির করিয়া দিয়াছিল। ইহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল পবন পাইয়াছিলাম—যদিও এখনও কুয়াসার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম না। যে জীব এই মঙ্গল আনয়ন করিয়াছিল, তাহাকে আমি কোন্ দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় হত্যা করিয়া ফেলিলাম!

আমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দিল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, এই হত্যা-কার্য্যের ফলে আমাদের কি যেন ঘোর অনিষ্ট হইবে। উপকারীর প্রাণহিংসা কি ভগবান্ ক্ষমা করিবেন? এই কারণে আমি সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইলাম।

কিন্তু কৈ, বিপৎপাত তো কিছুই হইল না। বরং

কুয়াসা কাটিয়া গেল, সূর্য্যদেব উজ্জ্বল কর-প্রসারণ করিলেন, অনুকূল বায়ু তো পূর্ব্ব হইতেই বহিতেছিল। তুষার-সমুদ্র পার হইয়া এখন আমাদের জাহাজ পুনরায় উত্তর-দিকে ধাবিত হইল।

তখন আর আমার সঙ্গীরা আমার দোষ দিল না যে, আমি পক্ষীটিকে সংহার করিয়া কোন অন্যায় কাজ করিয়াছি, বরং এখন তাহারা উল্টা কথাই বলিতে লাগিল যে, ঐ পক্ষীটাই তো কুয়াসা ও অন্ধকার আনিয়াছিল, উহার মৃত্যুর পরই তো সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। হায়, মানুষে সুযোগ বুঝিয়াই এই প্রকারে দুই রকম কথা বলে। যাহা হউক, তাহারা এখন আমার এই হত্যা-ব্যাপার সমর্থন করিল।

কিন্তু মূর্খ আমরা, ভগবানের কোপ কি এড়ান যায়? জাহাজ তর্-তর্ বেগে চলিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে আমরা এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম! এই কি সেই বিখ্যাত প্রশান্ত মহাসাগর—যাহার কথামাত্র লোকমুখে শুনিয়াছি? এ সমুদ্রভাগে যে আর বাতাস বহে না, পাল নড়ে না, সব যেন একেবারে চুপচাপ হইয়া গেল। হায়,

এ কি হইল? এতদিন তো অন্ততঃ জলের শব্দ শুনিতে পাইতাম, এখন এ কি নীরব বারিধিবক্ষঃ—একেবারে নীরব নিথর। এই নীরবতার মধ্যে আমাদের আপনার কণ্ঠস্বরই কি ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

"And we did speak only to break
The silence of the Sea."

জাহাজ আর নড়ে না, একেবারে চিত্রাপিতবৎ নিশ্চল।

"As idle as a painted ship
Upon a painted ocean."

মহাশয়, কল্পনা করুন, আমাদের এ কি হইল? দিনের পর দিন একই স্থানে আমাদের পোত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হায়, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি আরম্ভ হইল। আমাদের পানীয় জল ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জল তো জাহাজের চারিদিকেই রহিয়াছে—জল ছাড়া তো দুচক্ষে আর কিছুই দেখা যায় না, অথচ পান করিবার উপায় নাই। সকলের কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিল,

জিহ্বা জড় হইল, বাক্‌শক্তি রহিত হইল—গলায় যেন ছাতু ঢুকিয়া সব রস শুকাইয়া দিয়াছে। এ কি ভীষণ শাস্তি—সম্মুখে জল—অপর্য্যাপ্ত জল—যত জল চাও, তত জল, অথচ তাহা পেয় নহে। জল দেখিয়া দেখিয়া ঘৃণা ধরিয়া গেল, সমুদ্রটা দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, সামুদ্রিক জীবগুলি দেখিলে ন্যক্কার আসিতে লাগিল—সে বিষম জ্বালা তোমায় কি করিয়া বুঝাইব ?

নিশ্চয়ই দেবতার কোপে আমাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে—আর নিস্তার নাই। আমাদের একজন স্বপ্নও দেখিল যে, তুষার-সমুদ্রের দেবতা আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু, আমরা তাঁহার আশ্রিত পক্ষীকে হত্যা করিয়াছি; তজ্জন্যই তিনি সমুদ্রবক্ষে আমাদের অনুসরণ করিয়া আসিয়া এই দুর্ব্বিপাকে ফেলিয়াছেন। ভাগ্যে আরো কত কি আছে, কে জানে ?

এখন বুঝিলাম, আমিই এই অস্বাভাবিক বিপদের কারণ। আমার সঙ্গীরা এখন সকলেই একবাক্যে আমাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিল—আমার পাপের তাহারাও ভাগী, তাহারাও শাস্তি পাইতেছে। কিন্তু

সকলেই আপাততঃ বাক্যহীন, কেহই আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিতে পারিল না—কেবল তাহাদের চক্ষুর দৃষ্টি দেখিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল, আজ বুঝি আমার সঙ্গীরাই আমাকে নিধন করে। ওঃ, তখন যদি আমায় মারিয়া ফেলিত, আমার পক্ষে মঙ্গলই হইত, কিন্তু আমার ভাগ্যে আরো কত কি আছে, আমার মৃত্যু হইবে কেন? তাহারা সকলে মিলিয়া আমার পাপের শাস্তি মাত্র এই করিল যে, আমার গলার ক্রুশ-চিহ্ন খুলিয়া তৎপরিবর্ত্তে সেই মৃত পক্ষীটা আমার গলায় বাঁধিয়া দিল। এই প্রকারে আমার নিজের পাপচিহ্ন নিজেকে বহন করিতে হইল।"

বিবাহ-উৎসবে বেগে সঙ্গীত চলিতেছে, আমোদ-প্রমোদের রবে চারিদিক্ মুখরিত হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, বরযাত্র মহাশয় কি যেন কি শক্তিতে বৃদ্ধ কর্ত্তৃক এমনি মন্ত্রমুগ্ধ যে, তাঁহার সে দিকে মন দিবার আদৌ অবসর ছিল না। বাধ্য হইয়া যেন তিনি এই বৃদ্ধ নাবিকের অদ্ভুত কাহিনী মনঃসংযোগ করিয়া শুনিতেছিলেন।

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল, "জাহাজ এখনও নিশ্চল, আমরাও নিশ্চল, কোন কাজ নাই। কাজ করিবার ক্ষমতাও নাই। নিশ্চলভাবে একাদিক্রমে কতদিন যে রহিলাম, বলিতে পারি না। তৃষ্ণায় তো ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, আমরা যেন কতকগুলি উন্মাদগ্রস্ত লোক একত্র হইয়া জনমানবশূন্য সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

সহসা দূরে আকাশের গায় মিশিয়া রহিয়াছে, এমন একটা কি যেন কাল দাগ দেখিতে পাইলাম। সকলে সোৎসুকে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে সেই কৃষ্ণবর্ণ রেখা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর দেখা যাইতে লাগিল—ক্রমে বোধ হইল, এ যে একখানা জাহাজের মত। কি উল্লাস! আজ বুঝি পরিত্রাণ হইবে। কিন্তু কণ্ঠ তো কাঠ হইয়া গিয়াছে, উল্লাস প্রকাশ করিতে তো স্বর ফোটে না। তখন আমি নিজের মাংস নিজে কামড়াইয়া, তাহার রক্ত কথঞ্চিৎ পান করিয়া কণ্ঠ ভিজাইয়া লইলাম ও চীৎকার করিয়া উঠিলাম—'দেখ দেখ, জাহাজ, জাহাজ!'

কিন্তু হায়, এ কি অদ্ভুত জাহাজ! ক্রমে নিকটে আসিলে যাহা দেখিলাম, তাহা কি তোমরা বিশ্বাস করিবে? কাছে যত আসিতে লাগিল, ততই বুঝিতে পারিলাম, এ একটা ভৌতিক জাহাজ। মাকড়সার জালে ইহার পাল বুনান, জাহাজের মাত্র একটা কাঠামো আছে। তক্তা বা ডেক্ কিছুই নাই। এটা চলে কি করিয়া? আরো ভয়ানক দেখিলাম, ঐ জাহাজের উপর দুই মূর্ত্তি বসিয়াছে—একজন পুরুষ, দ্বিতীয়টি স্ত্রীলোক। পুরুষটির কি ভয়ানক চেহারা—স্বয়ং যমদেবেরও এরূপ ভীষণ চেহারা কল্পনা করা যায় না। স্ত্রীলোকটির সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠ-রোগীর মত সাদা, ওষ্ঠ ভয়ানক লাল, চক্ষে অকুণ্ঠিত দৃষ্টি, চুলগুলি একবারে হল্‌দে। ঐ স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলে যেন প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বুঝিলাম, প্রথমটি স্বয়ং মৃত্যুর অবয়ব, দ্বিতীয়টি জীবন্ত মৃত্যুর রূপ।

এই পুরুষ ও স্ত্রী সেই ভৌতিক জাহাজে পাশা খেলিতেছিল। আমাদের নিকটস্থ হইবামাত্র স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি জিতিয়াছি, আমি জিতিয়াছি।"

তার পর চক্ষের নিমিষে সে ভৌতিক জাহাজ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। দেখিয়া শুনিয়া কি যেন এক অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে আমার অন্তর কাঁপিতে লাগিল।

চাহিয়া দেখিলাম, আমার দুই শত সঙ্গীদের সকলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর হরি হরি, ক্ষণপরেই তাহারা প্রত্যেকে ধপ্ ধপ্ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল ও প্রত্যেকের দেহ হইতে প্রাণ সোঁ শব্দ করিয়া আমার কানের পাশ দিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল।"

পাঠক, এই কাহিনী শুনিয়া বরযাত্র মহাশয়ের মনে কি হইল, ভাব দেখি। দেবতার কোপে পড়িয়া জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—এই বৃদ্ধ নাবিকও সেই জাহাজেই ছিল। তবে কি বেচারা বরযাত্র এই বৃদ্ধনাবিকরূপী প্রেতাত্মার কথা শুনিতেছেন? বরযাত্র মহাশয়ের সুতরাং বড়ই ভীতির সঞ্চার হইল, তিনি কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হে বৃদ্ধ, তুমি তবে ভূত? দোহাই তোমার, আমার বড় ভয়

করিতেছে—আমায় ছাড়িয়া দাও। তোমাকে তো আমি ভূত ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না। তোমার সঙ্গীদের সহিত তুমিও নিশ্চয় মরিয়া ভূত হইয়াছ।"

বৃদ্ধ বলিল, "ভয় করিও না ভাই। সকলে মরিল বটে, কিন্তু আমি হতভাগ্য বাঁচিয়া রহিলাম—আমার কি মরণ হইতে পারে? কপালে আমার আরো অনেক শাস্তি লেখা ছিল। আমি মরিলাম না, আর সকলে মরিল। এই দুই শত মড়া লইয়া একা জীবন্ত আমি সেই জাহাজে রহিলাম। কি ভীষণ! নিস্পন্দ সেই মহা সমুদ্রবক্ষে একাকী আমি—তার উপর দেবতার কোপ, আমার এইরূপে অদ্ভুতভাবে শাস্তি করিতেছে। হায়, কোন দেবতাও আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন না!"

"Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide, wide sea!
And never a saint took pity on
My soul in agony."

এখন কি করি? সমুদ্রের দিকে চাই, কদর্য্য জলজন্তুগুলাকে দেখিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লই—জাহাজের দিকে

চাই, সঙ্গীদিগের অসাড় মৃত দেহ পতিত দেখিতে পাই—ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে চাই, তা পাপী আমি, প্রাণে কোন কোমলতা নাই, ভক্তি কোথা হইতে আসিবে? আর তো চক্ষু মেলিয়া থাকিতে পারি না—দেখিবার তো বস্তু নাই, শুধু সাগর আর আকাশ—তা তো দেখিয়া দেখিয়া ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, এ আমার কি ভীষণ অবস্থা—যে মহিমাময় সৌন্দর্য্যের আধার সাগর ও আকাশ, তাহাতে আমার একেবারে অরুচি ধরিয়া গিয়াছে। তখন আমি চক্ষু মুদিলাম, আর চক্ষু খুলিব না ভাবিলাম, কিন্তু প্রাণের ভিতর যে যাতনা, চক্ষু মুদিয়া কি নিস্তার আছে? আবার চক্ষু খুলিলাম, অমনি চোখে পড়িল, আমার সঙ্গীদের মরণকালীন সেই তীব্র দৃষ্টি। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল, কপোলের ধমনী দপ্ দপ্ করিতে লাগিল।

এই ভয়ানক অবস্থায় সাত দিন সাত রাত্রি কাটাইলাম। আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে? এই দীর্ঘ,—অতি দীর্ঘ সাত দিনরাত্রির অসহ্য যাতনায়

আমার পীড়িত প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, আমার জীবন অতি তুচ্ছ।

তার পর কি হইল, বলি শুন। চন্দ্রালোকে দেখিলাম, জলের মধ্যে কতই না সামুদ্রিক জীব খেলিয়া বেড়াইতেছে, আর কতই না রকমের রং-বেরং তাহাদের অঙ্গের শোভা। ইহাদের তো কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। ইহারা কি সুখী! দেখিয়া দেখিয়া যেন আমার হৃদয় কেমন সরস হইতে লাগিল। অন্যের সুখ দেখিয়া—মনুষ্যেতর কদর্য্য জীবের পর্য্যন্ত সুখ দেখিয়া, আজ আমার হিংসা না হইয়া কেমন সুখ অনুভব হইতে লাগিল। আমি মনে মনে বলিলাম—আহা, ভগবান্ তোমাদের সুখী করিয়াছেন, তোমরা চিরকাল সুখীই থাক, আমার মতন তোমাদের যেন দুরদৃষ্ট না হয়।

দেখ ভাই, পরের সুখ দেখিয়া সুখী হইও,—ইতর জীবেরও সুখ দেখিয়া সুখী হইও। পাপিষ্ঠ আমি, এ ধারণা আমার হৃদয়ে এত দিন ছিল না—আজ হইল।

ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন, নতুবা এ কঠোর হৃদয়ে এ প্রেমের ভাব কেমন করিয়া আসিল? আর

প্রেমভাবের এমনই গুণ যে, আমার মুক্তির পথ তখন হইতেই পরিষ্কার হইল—ভগবানে বিশ্বাস প্রাণে আসিল, ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিবার ক্ষমতা পাইলাম, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম। অমনি স্বকৃত পাপের চিহ্ন সেই পক্ষীটির মৃতদেহ—যাহা আমার গলায় এ পর্য্যন্ত বাঁধা ছিল, খসিয়া পড়িল ও সাগরজলে তলাইয়া গেল। তার পর—এত কাল পরে আমার চক্ষু ভাঙ্গিয়া ঘুম আসিল—আমি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।”

বৃদ্ধ একটু থামিল—বরযাত্র মহাশয় অবাক্—অনিচ্ছায় এই বৃদ্ধের কাহিনী শুনিতে আরম্ভ করিয়া এখন তিনি চমৎকৃত। মানুষকে এমন কল্পনা-বহির্ভূত অবস্থাতেও পড়িতে হয়?

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিল, “কি মধুর সে নিদ্রা, তোমাকে কি বুঝাইব? আর শুধু তো নিদ্রা নহে—ভগবানের অনুগ্রহে আমার ঘুমন্ত অবস্থায় বৃষ্টিপাত হইল। ঐ বৃষ্টিতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমার পিপাসিত দেহ এত কাল পরে জল-বিন্দু পাইয়া শীতল হইল—আমি

মুখ হাঁ করিয়া জলকণা আস্বাদন করিতে লাগিলাম—আমার অঙ্গের প্রত্যেক লোমকূপ সাগ্রহে জলবিন্দু গ্রহণ করিতে লাগিল।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আকাশে ঘন বিদ্যুৎছটা দেখা গেল, মেঘের গর্জ্জন আরম্ভ হইল, প্রবল-বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। কিন্তু জাহাজের পাল তো একটুও নড়িল না, অথচ জাহাজখানি নড়িয়া উঠিল, ক্রমে চলিতে লাগিল, অথচ চালাইবার লোক নাই? অমনি দেখি অদ্ভুত আর এক ব্যাপার! মৃতদেহ-গুলিও নড়িল, ক্রমে উঠিয়া বসিল, পরে স্ব স্ব স্থানে গিয়া জাহাজের কাজে লাগিয়া গেল। মড়া বাঁচিয়া উঠে কেহ কি দেখিয়াছ? আর এই যে মড়া গুলি বাঁচিয়া উঠিল, তাহারা সত্যি সত্যি বাঁচিল কৈ? কথা তো বলে না, চক্ষু তো নড়ে না—কি এক স্থিরদৃষ্টি ইহাদের চক্ষে! হায়, হায়, এ আবার কি হইল? শেষে কি জাহাজটা ভূতের কবলে পড়িল? আমি কি ভূতের সঙ্গে জাহাজ চালাইতেছি? এই তো আমি একজনের সঙ্গে দড়ি ধরিয়া টানিতেছি, অঙ্গে অঙ্গে

স্পর্শ পর্য্যন্ত হইল, কিন্তু কৈ, সে তো আমার সঙ্গে কোন কথা কহিল না ?"

বরযাত্র মহাশয়ের আবার ভয় হইল, বুঝি তবে এই বৃদ্ধ বাস্তবিকই ভূত। সকলেই যদি ভূত হইয়াছিল, বৃদ্ধই বা বাদ যাইবে কেন ? ভূতের সঙ্গে থাকিয়া নিশ্চয়ই সে ভূত বই আর কিছু হইতে পারে না।

বৃদ্ধ বলিল, "ভাই, ভয় করিও না, আমি ভূত হই নাই। আর আমার সঙ্গীরাও ভূত হয় নাই। তাহাদের মৃতদেহে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছিল—ভূতের নহে। যখন রজনী প্রভাত হইল, তখনি এই কথা বুঝিতে পারিলাম। কারণ, ভোর হইবামাত্র এই সমস্ত দেহগুলি মাস্তুলের চারি ধার জড়াইয়া ধরিল ও তাহাদের মুখের ভিতর হইতে অতি সুমধুর সঙ্গীত বাহির হইয়া আকাশে মিশাইয়া গেল। ক্ষণ পরেই আকাশ হইতে নানাপ্রকার সঙ্গীতের সুর শ্রুত হইল ;—কখনও বীণায়, কখনও এস্রাজে, কখনও অন্য কোন বাদ্য যন্ত্রে ; কখনও কোকিলের রব, কখনও পাপিয়ার মধুর আলাপ। বেলা বাড়িতে লাগিল, এই মধুর ধ্বনিও ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া

যাইতে লাগিল, তবে একেবারে অন্তর্হিত হইল না। এরূপ স্বর্গীয় সঙ্গীত কি ভৌতিক প্রাণী করিতে পারে? তাই বলিতেছি যে, ঐ সকল মৃতদেহে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

জাহাজ সমানে চলিতে লাগিল, অথচ বাতাস নাই। ভাই এ সবই ভৌতিক ব্যাপার। সেই যে দেবতার আশ্রিত পক্ষী আমরা বধ করিয়াছিলাম, তিনিই জলের ভিতর থাকিয়া এই জাহাজকে চালিত করিতে-ছিলেন।

ক্রমে যখন মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইল, তখন সে মধুর ধ্বনির আর লেশমাত্র রহিল না। জাহাজখানিও হঠাৎ থামিয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। অল্প পরেই জাহাজখানি দুলিতে লাগিল, এরূপ তো জাহাজ কখনও নড়ে নাই। তার পর তীরবেগে সাম্নে ছুটিয়া চলিল। জাহাজের এই হঠাৎ গতিতে আমি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলাম ও অবিলম্বে চেতনা হারাইলাম।

কতক্ষণ এই অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম, বলিতে পারি না। চেতনা তখনও সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে

নাই, এমন সময়ে দুইটি অশরীরিণী বাণী শুনিতে পাইলাম।

প্রথম বাণী—'এই কি সেই ব্যক্তি, যে তুষার-দেশের দেবতার আশ্রিত পক্ষীকে হত্যা করিয়াছে?'
দ্বিতীয় বাণী—হাঁ, এই সেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক হইয়াছে, আরো কিছু বাকী আছে।

প্র।—আচ্ছা, জাহাজখানি এত জোরে চলিতেছে কেন?

দ্বি।—দেবতার বলে জাহাজ ঐরূপ বেগে চলিতেছে। চল, আমরা যাই। এখনি বৃদ্ধ নাবিকের চৈতন্য হইবে, তখন আর জাহাজ একেবারে নড়িবে না।

এই দৈববাক্য শুনিয়া বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে আরো যেন কি আছে। ঘুম ভাঙ্গিল, অমনি দেখি, সব মৃতদেহগুলি একস্থানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের চক্ষুতে সেই নিশ্চল ক্রূর দৃষ্টি। আমি চাহিয়া চাহিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম, ভয়ে প্রাণ কাঁপিতে লাগিল, কি যেন মোহবশে সেই ভয়ানক দৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইতে পারিলাম না। হায়, জাগিয়া আবার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল!

জাহাজের বেগ মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। কতক্ষণ আমার এই ভয়াকুল অবস্থা ছিল, জানি না; কিন্তু সহসা আমার দৃষ্টি সেই মৃতদেহ সকলের উপর হইতে সমুদ্রবক্ষে নিপাতিত করিতে পারিলাম ও সেই মুহূর্ত্তেই আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল।

কোথা হইতে মন্দ বায়ু আসিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিয়া দিল, অথচ সমুদ্রবক্ষে বায়ুর অস্তিত্বের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না, জলে ঢেউর লেশমাত্র ছিল না। কি সে শান্তিময় মৃদু-মন্দ পবন—আমার প্রাণে কি যে আশার কথা বলিয়া গেল, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। আবার জাহাজখানি অতি দ্রুত চলিতে লাগিল, অথচ এই বেগে গমনে জাহাজের কোন প্রকার আন্দোলন অনুভব করিলাম না। তার পর, কি আনন্দ, দেখি, এ যে আমাদের দেশের সমুদ্র, ঐ যে আমাদের বন্দর, ঐ যে আমাদের গির্জ্জার চূড়া! আমি চক্ষু মুদিলাম—এ কি স্বপ্ন! হে ভগবান্, স্বপ্ন যদি হয়, এ স্বপ্ন যেন আর না ভাঙ্গে। বাস্তবিক স্বদেশে ফিরিয়া আসিব, এ আশা কি এই পাপিষ্ঠ করিতে পারে?

চক্ষু খুলিয়া দেখি, না, স্বপ্ন নয়, সত্যই তো ঐ আমাদের ঘাট। কিন্তু এমন সময়ে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। ঘাটের সমস্ত জলটা রং-বেরং হইয়া যেন জ্বলিতেছে। কোথা হইতে এ উজ্জ্বল আলোক আসিয়া জলে পড়িতেছে? ইতস্ততঃ চাহিয়া অবশেষে জাহাজের ডেকের দিকে চাহিয়া দেখি, এক মহিমাময় দৃশ্য! ডেকের উপর সেই দুই শত মৃতদেহ পড়িয়া আছে ও প্রত্যেক দেহের উপর আলোকময় এক এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়া হস্ত দোলাইতেছে—এই আলোর প্রভাই জলে পড়িয়া সমস্ত ঘাট আলোকিত করিয়াছে।

নয়ন ফিরাইয়া দেখি, অদূরে ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে চড়িয়া পাইলট ও তাহার বালক আমাদের জাহাজ ঘাটে ভিড়াইবার জন্য লইতে আসিতেছে। দেখিলাম, সেই সঙ্গে ঐ বন্দরের চিরপরিচিত ও সর্ব্বজনপূজ্য সন্ন্যাসী মহাশয়ও আছেন। তাঁহার পরিচিত স্বর শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল, ভাবিলাম, এই সংযোগ নিশ্চয়ই ভগবানের অনুগ্রহ। আমি এই সাধু পুরুষের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিব ও জীবনের গতি যাহা করিবার তিনিই করিয়া দিবেন।

এই সব ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে দেখি, কোথায় সে আলোক, সব নিবিয়া গিয়াছে। এ সব ভৌতিক ব্যাপারের কথা আর কত বলিব? এখন যাহা ঘটিল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। বলিতেছি, শুন। পাইলটের নৌকা আমাদের জাহাজের নিকট আসিয়া যেই ঠেকিল, অমনি জাহাজের তলে আশ্চর্য্যজনক এক গুড়-গুড় শব্দ আরম্ভ হইল ও অনতিবিলম্বে জাহাজখানি সশব্দে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সব সহিত তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল।

কতক্ষণ জলে ভাসিয়াছিলাম ও আর কি ব্যাপার হইয়াছিল, আমি জানি না। চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, পাইলটের নৌকায় পড়িয়া আছি—মাত্র আমারই উদ্ধার হইয়াছে, জাহাজের আর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই।

সেই নৌকার আরোহী তিন জন আমার চেহারা দেখিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে, আমি কি প্রকারের জীব। আর কি আমার মানুষের মত চেহারা ছিল? আর যে সব ভৌতিক ব্যাপার এই তিন জনে

স্বচক্ষে দেখিল, তাহাতে তাহারা আমায় ভূতপ্রেত বলিয়াই ঠাওরাইল।

আমি কথা বলিবার জন্য যেই মুখ খুলিয়াছি অমনি পাইলট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল; বুঝি ভাবিল, এই ভূতটা তাহাকে খাইবার জন্য বদনব্যাদান করিতেছে। অতঃপর আমি যেই নৌকা বাহিবার জন্য দাঁড়ে হাত দিয়াছি, অমনি পাইলটের বালকটি বিস্ফারিত-চক্ষে আমায় দেখিতে লাগিল ও সহসা তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। সে হো হো করিয়া পাগলের মত হাসিয়া বলিল, 'বাহাবা, স্বয়ং সয়তান নৌকা চালাইতেছে!' সন্ন্যাসী মহাশয় যথাসম্ভব ধীর ছিলেন। কিন্তু দেখিলাম, তিনিও কথঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছেন। এই দীর্ঘ দিবসগুলি আমি যে ঘোর মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাটাইয়াছি, তাহা আমার মনুষ্যত্বের চিহ্ন যে বিলোপ করিয়া আমাকে জনসমাজে হাবভাব চেহারায় ভূতের মত প্রতিপন্ন করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

যাহা হউক, তীরে নৌকা লাগাইলাম—এত কাল পরে আবার মাটীতে পা দিলাম। আর মাটীতে পা

দিতে পারিব, তাহার আশা কি ছিল? তীরে উঠিয়াই সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদপ্রান্তে পড়িলাম, কাতরে বলিলাম, 'আমায় রক্ষা করুন, আমার যা হয় একটা বিধান করুন।' তিনি তখন বলিলেন, 'তোমার কাহিনী অকপটে সমস্ত আমাকে বল, তার পর তোমার ব্যবস্থা হইবে।'

অমনি আমার সমস্ত শরীরে যেন কি এক জ্বালা ছুটিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইতে লাগিল, কে যেন জোর করিয়া আমায় আমার কাহিনী বলাইতে লাগিল। যেই আমার কাহিনী আরম্ভ করিলাম, অমনি সকল জ্বালার নিবারণ হইল।

সেই হইতে আমি গৃহহীন পথিক—সমস্ত জগতে যেথানে দু'চক্ষু যায়, ঘুরিয়া বেড়াই ও হঠাৎএক এক সময়ে যে রকম জ্বালার কথা এখনি বলিলাম, ঐরূপ জ্বালা অনুভব করি। তখন সম্মুখে যাহাকে পাই, তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া আমার কাহিনী শুনাই; তখন আমার সেই জ্বালার নিবৃত্তি হয়। তাই ভাই, আজ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে জোর করিয়া আমার এই অলৌকিক কাহিনী শুনাইলাম।

আর কি বলিব? আমার কাহিনী শুনিয়া যদি তোমার একটুমাত্রও উপকার হয়, তবেই তোমার ক্ষমা পাইতে পারি। দেখ ভাই, এই হতভাগ্য ভগবানের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া কি যাতনাই সহিয়াছে।

"This soul hath been
Alone on a wide, wide sea ;
So lovely it was, that God himself
Scarce seemed there to be.

ঘোর সমুদ্রে একা—সে যে কি যাতনা, একবার ভাবিয়া দেখ ভাই। আর ভাই, শেষ কথা বলিয়া যাই এই যে—

বিশ্বহিত—জীবে দয়া, ইহাই চরম ;
অন্য ধর্ম্ম সব মিছা, রাখিও স্মরণ।
এখন আমায় বিদায় দাও।"

কাহিনী শেষ করিয়া বৃদ্ধ নাবিক আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া তীরবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রুস্তমের পিতার নাম জাল ও পিতামহের নাম শাম। পিতা ও পিতামহ উভয়েই অসামান্য বীরপুরুষ ছিলেন ও উভয়েরই সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী প্রচলিত আছে। সাহস ও বীর্য্যে তাঁহারা অতুল ছিলেন, বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতায় কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ ছিল না। পারস্য-রাজ্যের আপদ্-বিপদে ইহাঁরা অগ্রণী হইয়া সম্রাট্ ও সাম্রাজ্যকে কতবার রক্ষা করিয়াছিলেন।

রুস্তম পিতা ও পিতামহের সমস্ত সদ্গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন। অতি শৈশব হইতেই রুস্তম অসামান্য বীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নামে পারস্যের শত্রু-সম্প্রদায় কম্পিত হইত, যুদ্ধে রুস্তম অধিনায়ক থাকিলে কখনও পারস্যের পরাজয় ঘটিত না।

রুস্তমের বীরত্বকাহিনী সমগ্র পারস্য-রাজ্যে ছাইয়া পড়িলে পর, এক রাজকুমারীর বড়ই অভিলাষ হইল যে, তিনি রুস্তমকে পতিত্বে বরণ করেন। এই জন্য তিনি কৌশল করিয়া নিজের লোক দ্বারা রুস্তমের স্বনামপ্রসিদ্ধ অশ্ব রুক্সকে অপহরণ করান। উদ্দেশ্য এই যে, অশ্বের

অনুসরণ করিয়া রুস্তম এই রাজকুমারীর দেশে উপস্থিত হইবেন—অন্যথা ঐ দেশে রুস্তমের যাইবার কোন কারণ ছিল না; কেন না, এই প্রদেশ—উহার নাম আদার-বাইজান—পারস্যের একেবারে পশ্চিম-সীমান্তে অবস্থিত। সেই প্রদেশ অসভ্য জাতিতে পরিপূর্ণ, মহাবীর রুস্তম সেখানে যাইবেন কেন?

রুস্তম অশ্বের অন্বেষণে আদারবাইজানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে মহা সমাদর প্রদর্শন করিলেন, অশ্ব প্রতিদান করিলেন ও তৎসঙ্গে বিবাহার্থ স্বীয় কন্যাকেও অর্পণ করিলেন। অশ্বপ্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞ রুস্তম এই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্যই মনে করিলেন।

কিয়ৎকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া রুস্তম স্বদেশে প্রস্থান করিলেন—নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন না। কারণ, তিনি উচ্চবংশ-সমুদ্ভুত, এইরূপ অসবর্ণ-বিবাহ তাঁহার পক্ষে গৌরবের হানিকর। তাই তিনি এই বিবাহ গোপন করিবার জন্য স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া গেলেন।

যাইবার সময় স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, "তোমার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আমায় সংবাদ পাঠাইও।" অধিকন্তু একটি চিহ্ন দিয়া বলিলেন, "যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহার বাহুতে এই চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিও, আর কন্যা হইলে উহা কপালে অঙ্কিত করিবে।"

যথাকালে রাজকুমারী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল সোরাব। যথাবিধি তাহার বাহুতে পিতৃদত্ত চিহ্ন অঙ্কিত হইল। কিন্তু রুস্তমের নিকট সংবাদ পাঠান হইল যে, কন্যা হইয়াছে। রাজকুমারী ভাবিলেন, পুত্র হইয়াছে শুনিলে রুস্তম হয়তো বড় হইলে ইহাকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবে, এবং পুত্র বাপের মত বীরত্বগর্ব্বে কোথায় কবে জীবন হারাইবে। কোমল-প্রাণা জননী তাই রুস্তমের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, কন্যা জন্মিয়াছে।

কিন্তু রাজকুমারী ভুল করিলেন। হুতাশন কখনও লুকাইয়া রাখা যায় না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে সোরাব পিতার ন্যায়ই উন্নতদেহ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কালে, একদিন, মাতাকে ধরিয়া বসিল, 'বল, আমার পিতা কে?'

মাতা এড়াইতে না পারিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে, রুস্তম তাহার পিতা। তদবধি সোরাবের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল, আমি পিতার নিকট পরিচিত হইব। বীরত্বে পিতার ন্যায় হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইব, তিনি বীর পুত্রকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। শয়নে স্বপনে সোরাবের চিন্তা হইল, কি উপায়ে তিনি সসম্মানে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, পারস্যের শত্রু তুর্কমানদিগের সহিত মিলিত হইয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিবেন, পারস্য-বাহিনীর সহিত নিশ্চয়ই রুস্তম থাকিবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগর্বে তিনি পিতাকে নিজ পরাক্রম দেখাইয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হইবেন।

বর্ত্তমান তুর্কিস্থানের মধ্য দিয়া অক্ষণ নামে নদী প্রবাহিত। পুরাকালে ইহার নাম ছিল আমুদরিয়া।

এই আমুদরিয়ার তটে যুদ্ধার্থ সমবেত—তুরক ও পারস্যবাহিনী।

তুরক-শিবিরে সোরাব অনিদ্রিত-নয়নে পাদচারণা করিতেছে। প্রাতে হয় তো এই দুই বাহিনীর যুদ্ধ

হইবে, পারস্য-বাহিনীর সহিত হয় ত রুস্তম আসিয়াছেন, কি ভাবে এতকাল পরে পিতৃসন্দর্শন ঘটিবে অথবা ঘটিবে কি না—এই সকল চিন্তায় সোরাবের মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সোরাব ঘুমাইতে পারিতেছে না। তাই ভাল করিয়া উষার আলোক না দেখা দিতেই, সে বর্ম্মাদি পরিধান করিয়া অসি গ্রহণ করিল ও শিবির হইতে বাহির হইল।

তুরক-শিবির-শ্রেণীর মধ্য দিয়া সোরাব চলিতে লাগিল। চরাচর নিস্তব্ধ—সৈনিকগণ নিদ্রায় বিভোর। উষার স্বল্প আলোকে একটি শিবির লক্ষ্য করিয়া সোরাব তথায় আসিল ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তুরক-সৈন্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধ পরাণউইসার শয্যাপার্শ্বে ধীরে দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ সৈনিকের সজাগ নিদ্রা। তিনি অমনি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? শত্রুরা কি আক্রমণ করিয়াছে?"

সোরাব সন্নিকটে আসিয়া বলিল, "আমি সোরাব আসিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, শত্রুরা আক্রমণ করে নাই। আমি সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছি—

কেন, তাহা আপনি জানেন, আপনাকে সব বলিয়াছি। আমি পিতার অন্বেষণেই আপনাদের সৈন্য-বিভাগে কার্য্য নিয়াছি—আশা ছিল, এত দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার দর্শন পাইব ও নিজ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হইব। এত দিনেও সে ভাগ্য হইল না। আজ আমার এক প্রার্থনা আছে, তাহা আপনি পূরণ করুন। অনুগ্রহ করিয়া এই আজ্ঞা প্রচার করুন যে, আমি সোরাব পারস্যবাহিনীর যে কোন বীরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। যদি জয়লাভ করি, পিতা রুস্তম এই সোরাবের কাহিনী শুনিতে পাইবেন। আর যদি ঐ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, আমার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।

If I fall—

Old man, the dead need no one,

claim no kin.

জীবনে আর এই ব্যর্থ পিতৃদর্শন-বাসনা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। আপনি আমার পিতৃতুল্য —অদ্য দুই বাহিনীর যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, আমার অভী-প্সিত এই দ্বৈরথ-যুদ্ধ যাহাতে হয়, তাহার বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়া আমায় জন্মের মত কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করুন।”

বৃদ্ধ সেনাপতি এই যুবক বীরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সোরাবের এবংবিধ কাতর প্রার্থনাতে ব্যথিত হইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন ও সজল-চক্ষে বলিলেন, “বৎস সোরাব, কেন তোমার হৃদয় এই প্রকার চঞ্চল হইতেছে? যে পিতাকে তুমি কখনও দেখ নাই, তাহার জন্য তুমি কেন নিজের জীবন আহুতি দিবার প্রস্তাব করিতেছ? চিরকাল আমাদের সাহচর্য্যে থাকিতে কি তোমার তৃপ্তিবোধ হইবে না? আমরা কি তোমার যথাযোগ্য সমাদর করিতেছি না? আর দেখ, কি ভ্রান্ত ধারণা তোমার—যুদ্ধে কি তোমার পিতৃ-দর্শন ঘটিবে? বৎস, বাপের নিকট যাইতে চাও, অক্ষত-শরীরে তাঁহার কোলে স্থান লাভ করিতে চেষ্টা কর। আর তোমার প্রস্তাব আমি গ্রাহ্য করিলেই বা কি হইবে? রুস্তম হয় তো পারস্যবাহিনীর সহিত আসেন নাই। তুমি জান যে, সে কাল আর নাই—এখন রুস্তম বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন আর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বড় আসেন

না, নিজের পিতা বৃদ্ধ জালের সঙ্গে সীস্তানেই থাকেন। আরো শুনিয়াছি, পারস্য-সম্রাটের সহিত তাঁহার এখন মনান্তর হইয়াছে, তাই তিনি আর রণক্ষেত্রে আসেন না। এমতাবস্থায় রুস্তম যে ঐ বাহিনীর সঙ্গে আছেন ও তোমার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথা শুনিয়া তোমায় দর্শন দিবেন, তাহার ভরসা কোথায়? যাও বৎস, শিবিরে ফিরিয়া যাও—আর অসম্ভব কথা বলিও না।"

নীরব সোরাব নড়িল না।

তখন স্নেহপ্রাণ বৃদ্ধ বলিলেন, "সোরাব, তুমি যাইবে না? কিন্তু আমার প্রাণে যেন কেমন আশঙ্কা হইতেছে, এই যুদ্ধে তোমার অমঙ্গল হইবে। তোমার অভিলাষ পূরণ করিতে আমার মন সরিতেছে না—এই বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে তোমায় নিরাপদ্ স্থানে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। যুদ্ধ করিয়া পিতৃদর্শন-লাভ করিবে, এ অদ্ভুত কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এখনও তুমি নিবৃত্ত হও।"

সোরাব পূর্ব্ববৎ নীরব।

বৃদ্ধ আর পারিলেন না, বলিলেন, "দেখিতেছি, এই

ব্যাপারে আমার চেষ্টা বৃথা। নিয়তিকে কে রোধিবে? সিংহশিশু তুমি—বৃথায় আমি রুস্তমের পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছি। যাও সোরাব, তোমার প্রার্থনানুসারেই আমি বন্দোবস্ত করিব।”

সূর্য্যোদয় হইয়াছে। তুরক ও পারস্য শিবির হইতে উভয় বাহিনী পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ বাহির হইয়া দুই ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধার্থে সকলে প্রস্তুত। এমন সময়ে বৃদ্ধ সেনাপতি সৈন্যদলের অগ্রভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পারস্যসেনাপতি ফেরুদও তাহা দেখিয়া অগ্রভাগে আসিলেন। দুই সৈন্যবলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুই দলের সেনাপতি।

পরাণউইসা ফেরুদকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “তোমরা সকলে অবধান কর। আজকার দিন যুদ্ধ স্থগিত থাকুক। তৎপরিবর্ত্তে আমাদের পক্ষের বীরপুঙ্গব সোরাবের সঙ্গে তোমাদের পক্ষীয় যে কোন বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হউক। তোমরা রাজি কি না?”

তুরক-সৈন্যদলে মহা উল্লাস প্রকাশ হইল—সোরাব তাহাদের প্রিয়বীর, সোরাবের গর্ব্বে তাহারা গর্ব্বিত।

অপরপক্ষে কিন্তু এই প্রস্তাবে মহাত্রাস উপস্থিত হইল। সোরাবের বীরত্বকাহিনী তাহারা বহুবার শুনিয়াছে—তাহার সমকক্ষ বীর তাহারা কোথা হইতে জোটাইবে?

পারস্য-সেনাপতি মহা ফাঁকরে পড়িলেন—অথচ এই যুদ্ধের আহ্বান স্বীকার না করিলে কাপুরুষ বলিয়া তাঁহাদের অতিশয় অখ্যাতি হইবে। কি করিবেন ভাবিতেছেন—দুই বাহিনী উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে একজন অমাত্য তাঁহাকে চুপি চুপি বলিল যে, গত রাত্রে আসিয়া রুস্তম পারস্য-বাহিনীর সন্নিকটেই শিবির-স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু অভিমানভরে পারস্য-সৈন্যের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলে, পারস্য-বীরত্বের সম্মান-রক্ষার জন্য তিনি সোরাবের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত না হইয়া কি থাকিতে পারিবেন?

এই সংবাদে ফেরুদের মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি তখন অবিকম্পিতস্বরে পরাণউইসাকে উত্তর দিলেন, "আপনার প্রস্তাব উত্তম। সোরাবকে আপনারা সাজিতে বলুন, আমরা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত করিতেছি।"

কিন্তু রুস্তম যদি স্বীকার না করেন, তবে কি হইবে? ফেরুদ মহা চিন্তান্বিত হইলেন। গুদুর্জ্জ নামক অমাত্যকে রুস্তমের শিবিরে প্রেরণ করিলেন, তিনি গিয়া রুস্তমকে এই ব্যাপারে রাজি করাইবেন।

রক্তবর্ণ শিবিরশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বোচ্চ পট্টাবাসে রুস্তম বসিয়া আছেন—এইমাত্র আহার সমাপন করিয়াছেন, বসিয়া একটা পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে গুদুর্জ্জ গিয়া উপস্থিত।

গুদুর্জ্জকে দেখিয়াই রুস্তম আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—পূর্ব্বে পারস্যরাজ-সভায় তাঁহার সঙ্গে কতই না প্রীতি ছিল। বলিলেন, "তোমায় দেখিতে পাইলাম, ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্য। আসন গ্রহণ কর, বল সংবাদ কি? বরং কিছু পান আহার করিয়া লও, পরে কথাবার্ত্তা হইবে।"

গুদুর্জ্জ বসিলেন না, বলিলেন, "পান আহারের উপযুক্ত সময় এখন নহে—আমাদের মহা চিন্তার ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। তুরকেরা আমাদিগকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে। তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ কে করিবে

জান? সোরাবের নাম অবশ্য শুনিয়াছ? সেই বীর তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিবে। তাহার সমকক্ষ বীর আমরা কোথায় পাইব? এই সোরাব যেন দ্বিতীয় রুস্তম। হে রুস্তম, তুমি যদি এই সময় আমাদের মান না রাখ, তাহা হইলে আমাদের ঘোর পরাজয় হইবে, লজ্জার আর অবধি থাকিবে না। আমাদের আর কে আছে বল? পারস্যবীর যাহারা ছিল, সকলে বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, যাহারা নূতন, তাহারা সোরাবের সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। অতএব তুমি ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আমরা তোমার শরণ লইলাম, আমাদের মান রাখ।"

এখন রুস্তমের অভিমানের কারণ বলিতেছি। রুস্তমের নিকট পারস্যরাজ নানা প্রকার কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। কিন্তু রাজা কাই খসরু তরুণ যুবক—মস্তিষ্কও তরুণ। যাহার বলে তিনি বলীয়ান্, যাহার বীরত্বে তিনি রাজ্য নিষ্কণ্টকরূপে ভোগ করিতেছেন, বিপদ্ কাটিয়া গেলে পর আর তিনি সেই রুস্তমের যথোচিত সম্মান রক্ষা করেন নাই। তাই রুস্তম নিজের রাজ্যে

ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তথায় পৈতৃক রাজ্য-শাসনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আর পারস্যবাহিনীর সহিত যোগদান করিতেন না, এবং সেই জন্যই সুযোগ বুঝিয়া পারস্যের শত্রুরা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল, এই জন্যই রুস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে এবার আসিয়াও পারস্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ না দিয়া দূরে শিবির-সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

এই জন্য গুদুর্জের কথা শুনিয়া রুস্তম ভ্রূভঙ্গী করিলেন ও কঠোরভাবে বলিলেন, "এখন আর কেন আমার ডাক পড়িতেছে? আমিও তো বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছি। রাজা তো এখন যুবক-সম্প্রদায়কেই সম্মান করেন—সেই যুবক বীরেরাই তো সোরাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারে। আমাকে আর কেন? আমার দুরদৃষ্ট, নতুবা আজ আমার যুবক বীরপুত্র থাকিত—ভগবান্ তাহা না দিয়া আমাকে দিয়াছেন এক কোমলাঙ্গী কন্যা; তাহাকে কোন দিন দেখি নাই, দেখিবার বাসনাও নাই। আজ আমার পুত্র থাকিলে, তাহাকে যুদ্ধে পাঠাইয়া আমার পিতার রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আমি সম্পূর্ণ অবসর পাইতাম।

নিশ্চিন্তমনে স্বদেশে বসিয়া বীরপুত্রের যশের কথা শতমুখে শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম, এই হস্তে আর অসি-ধারণের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু এ সব কল্পনা করিয়া আর লাভ কি? আমার অদৃষ্টে বিধাতা অন্যরূপ লিখিয়াছেন।"

রুস্তমের এই প্রকার নির্ব্বেদ হইয়াছে দেখিয়া, গুদুর্জ্জ তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে কঠোর-ভাবে বলিলেন, "রুস্তমের উপযুক্ত কথাই তুমি বলিয়াছ! সোরাব তোমার সঙ্গেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চায়, আর তুমি লুকাইয়া থাকিবে! এখন হইতে মানুষে বলিবে—রুস্তম কৃপণের মত নিজের বীরত্ব-যশঃ লুকাইয়া রাখিতে চায়, বয়ঃ-কনিষ্ঠ বীরের সঙ্গে যদি যুদ্ধে হার হয়, এই ভয়ে রুস্তম আর যুদ্ধ করিতে চাহে না। লোকে তোমার এই অপযশ ঘোষণা করিবে। সে বড় ভাল হইবে, না?"

প্রকৃতবীরকে কাপুরুষ বলিলে সে বড়ই বিচলিত হয়। গুদুর্জ্জের শ্লেষবাক্য রুস্তমকে বড়ই বিঁধিল। তিনি বলিলেন, "গুদুর্জ্জ, তুমি বড়ই কঠোর কথা বলিয়াছ। তুমি জান, আমি কাপুরুষ নহি। যাও, লোককে

দেখাইব, কিরূপে রুস্তম কৃপণের মত নিজের বীরত্ব যশঃ লুকাইয়া বেড়ায়। আচ্ছা, আজ আমি নিজেকে লুকাইয়া দেখাইব, আমার বীরত্বগর্ব্ব বাস্তবিক কি না। তুরক-বাহিনীর নিকট বা কাহারও নিকট আমার পরিচয় দিতে পারিবে না। আমি সাধারণ যোদ্ধার ন্যায়, রুস্তমের যুদ্ধ-চিহ্ন গ্রহণ না করিয়াই পৃথিবীকে আজ দেখাইব যে, আমার শক্তি এখনও আমার বাহুতে আছে, আমার নামে নহে।"

রুস্তমের চক্ষুতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিল। গুদুর্জ্জ ভীতও হইলেন, প্রীতও হইলেন। আর তাঁহাদের আশঙ্কার কারণ নাই—স্বয়ং রুস্তম তাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু রুস্তমকে কঠোর বচনে ক্রোধ-পরবশ করিয়াছেন জানিয়া ভীতও হইলেন। যাহা হউক, সত্বর গিয়া সেনাপতিকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

রুস্তম শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বর্ম্মাদি পরিধান করিলেন। নিজের পরিচায়ক সমস্ত চিহ্ন বর্জ্জন করিলেন—মর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ মাত্র স্বর্ণখচিত এক

শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন—অমনি তাঁহার প্রিয় অশ্ব রুক্‌সও তাঁহার অনুসরণ করিল।

পারস্যবাহিনীর অগ্রভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়া-মাত্রেই তাহারা সকলে রুস্তমকে চিনিতে পারিয়া কলরব করিয়া উঠিল, তাহাদের মলিন চিন্তাযুক্ত মুখে প্রফুল্লতার রেখা ফুটিয়া উঠিল। অদূরে তুরকবাহিনী অবাক্ হইয়া এই সুবিশালবপু পারস্যবীরকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা জানিল না যে, ইনিই বিখ্যাত বীর রুস্তম।

ক্ষণ পরেই অপরদিক্ হইতে বীরসজ্জায় সজ্জিত সোরাবও দেখা দিল। তুরক-সেনাও জয়ধ্বনি করিয়া তাহাদের পক্ষীয় বীরের সংবর্দ্ধনা করিল। রুস্তম তাকাইয়া দেখিয়া লইলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে।

নদী-সৈকতে বালুকার উপর দুই দলের সৈন্য-সমাবেশ হইয়াছিল। সকলেই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিতে সমুৎসুক—পারসীক ও তুরক চক্রব্যূহ করিয়া চারিদিকে দাঁড়াইল, মধ্যের এই বালু-ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই দুই বীর—

সোরাব ও রুস্তম। অদূরে অনিমেষ-নয়নে তাকাইয়া রহিল—রুস্তমের প্রিয় অশ্ব রুকৃস।

বিধাতার বিধান—আজ পিতা ও পুত্র রণাকাঙ্ক্ষায় পরস্পরের সম্মুখীন। পিতা পুত্রকে চিনেন না, পুত্র পিতাকে জানে না। জগতের ইতিহাসে হয় তো এরূপ ঘটনা কত ঘটে। এইরূপ বিচিত্র কাহিনীই ভারতীয় ইতিহাসে অমর কবির করুণকাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে—এইরূপেই লব ও কুশ শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

রণভূমে দাঁড়াইয়া রুস্তম দেখিতেছেন, দূরে সোরাব আসিতেছে। এই কি সেই বীর—যে রুস্তমকে যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী চায়? এ যে তরুণ যুবক, ইহার যে সুখে পালিত তরুণ অঙ্গ! অথচ মুখের ভাবে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় মহিমা জড়িত রহিয়াছে! ইহার দেহ দেখিতে উন্নত বটে, কিন্তু ভীম-পরাক্রমের কোন চিহ্ন ত বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ হয় না! রুস্তম ভাবিলেন, এই বালক আমার সঙ্গে কি যুদ্ধ করিবে? ইহার এত দুঃসাহস কেন?

সোরাব নিকটস্থ হইল। রুস্তম তখনও একদৃষ্টে তাহার হাবভাবভঙ্গী দেখিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারেই কেন যেন প্রাণে আর্দ্রভাব আসিল। অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সোরাবকে ডাকিয়া বলিলেন, "বালক তুমি—রণ কি, তাহা জান না, মৃত্যু কি, তাহা বুঝ না। মরা অপেক্ষা কি বাঁচিয়া থাকা ভাল নয় ?

"Heaven's air is better than the cold
dead grave."

চাহিয়া দেখ, আমার এই বিশাল বপু বর্ম্ম দ্বারা দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছি। আর বহু যুদ্ধে আমি শত্রুক্ষয় করিয়াছি, শত্রু কখনও আমায় ক্ষয় করিতে পারে নাই। তুমি আমার সহিত রণ করিলে মৃত্যু ভিন্ন আর কি লাভ করিবে ? বৎস, তুমি ক্ষান্ত হও। তোমাকে দেখিয়া আমি যেন কেমন মুগ্ধ হইয়াছি। তুরকের সংস্রব ছাড়িয়া চল, আমার পুত্রস্থানীয় হইবে। আমি তোমায় যুদ্ধ-বিদ্যা শিখাইব। তোমার যশে আমার সুখলাভ হইবে। তোমার যোদ্ধৃবেশে কি যে চমৎকারিত্ব আছে,

দেখিয়া আমার কেবলই মনে হইতেছে, আমাদের দেশে বোধ হয়, তোমার মত বীর নাই।”

সমর-ব্যাপারে কি কোমলতার অবসর আছে? কিন্তু আজ সোরাবকে দেখিয়া রুস্তমের যুদ্ধোত্তম-নিরত কঠিন হৃদয়ও যেন কেমন দ্রব হইয়া গিয়াছিল। হতভাগ্য জানে না যে, আপন পুত্রকে দেখিয়াই হৃদয়ের এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা।

রুস্তমের গুরু-গম্ভীর স্বর সোরাবের প্রাণে কি যেন এক অপূর্ব্ব তন্ত্রী বাজাইয়া দিল। এই বিশালমূর্ত্তি পরিণত-বয়স্ক বীরপুঙ্গবকে দেখিয়া সোরাবের প্রাণে অননুভূত-পূর্ব্ব কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আনিয়া দিল। সহসা তাহার আশঙ্কা হইল, এই কি তাহার পিতা রুস্তম? সোরাব দৌড়িয়া গিয়া রুস্তমের পদতলে পড়িল, আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বল, শীঘ্র বল, সত্য করিয়া বল, তুমিই কি রুস্তম? দয়া করিয়া বল, তুমিই কি রুস্তম নও?”

রুস্তমের ভ্রু কুঞ্চিত হইল—কোমল ভাব এক মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। অদৃষ্টদেবী আকাশে অট্টহাসি করিলেন। বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইবে?

রুস্তমের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, "এই তুরক-বালক কি যেন চাতুরী করিতেছে—ইহাদের বিশ্বাস নাই। আমি রুস্তম বলিয়া কদাপি পরিচয় দিব না। কে জানে, ইহার মনে কি আছে? যদি 'আমি রুস্তম' এই কথা স্বীকার করি, এই বালক কোন না কোন ছুতায় আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না। আমার সঙ্গে মৌখিক ভালবাসা জানাইয়া পরে লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবে—আমি স্বয়ং রুস্তমকে একবার যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম, রুস্তম আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়াই আমাকে তাঁহার সমকক্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই বালকের ইহাই অভিসন্ধি। নতুবা যুদ্ধ করিতে আসিয়া পা ধরিয়া পড়ে কেন? না, আমি পরিচয় দিব না।"

হায় বীরত্বের অভিমান! তখনও সোরাব রুস্তমের পদপ্রান্তে পড়িয়া—তাহার চিরবাঞ্ছিত উত্তরের প্রতীক্ষায় রুস্তমের মুখোপরি দৃষ্টিবদ্ধ।

নিজ পরিচয়দানে অসম্মত রুস্তম কঠোরস্বরে বলিলেন, "বালক, রুস্তমের কথা কি বলিতেছ?

আমার পরিচয়ে তোমার আবশ্যক কি? ইরাণের পক্ষ হইতে তোমার রণাহ্বানে উপস্থিত হইয়াছি—পরিচয়ের কোন আবশ্যকতা দেখি না। আমার সহিতই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও, নতুবা পরাজয় স্বীকার কর।”

কঠোরে কোমলে মিশিল না। সোরাব ব্যথিত-প্রাণে পা ছাড়িয়া দিয়া অবাক্ হইয়া রুস্তমের প্রতি চাহিয়া রহিল।

রুস্তম আরও শ্লেষপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, “মূর্খ তুই! তোর স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তুই মনে করিয়াছিস, তোর ঐ পলুদেহ লইয়া রুস্তম ভিন্ন আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবি না? হা রে মূঢ়, রুস্তম যদি তোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে দেখিয়াই তুই মূর্চ্ছা যাইবি, যুদ্ধ করিবার কি আর অবসর থাকিবে?

Rash boy, men look on Rustum's face
and flee.

ওঠ্, আমার পরিচয় লইবার দরকার নাই, জানিয়া

রাখ্ যে, আজ এই আমুদরিয়ার পারে তোর মৃতদেহ শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করিবে।"

তীব্রবাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া সোরাব অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইল ও বীরদর্পে উত্তর করিল, "বটে? কিন্তু জানিও, আমি স্ত্রীলোক নহি যে, তোমার বাক্যে ভীত হইয়া পড়িব। তবে তুমি একটি কথা বড় সত্য বলিয়াছ। আজ রুস্তম আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তাঁহার সঙ্গে আমার যুদ্ধের আর সম্ভাবনা ছিল না। তাহার কারণ আর তোমায় বলিয়া কাজ নাই—তুমি তাহার যোগ্য নহ। তবে এস, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না—তুমি যুদ্ধে বিচক্ষণ স্বীকার করি, আমিও দেখিতে হীনবল, কিন্তু যুদ্ধের জয়-পরাজয় ভগবানের হাতে।

Success sways with the breath of Heaven.

যুদ্ধে তোমারই জয় হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ভবিষ্যৎগর্ভে কি নিহিত আছে, মানুষে তাহা বলিতে পারে না। ঘটনার স্রোত কাহাকে কোন্ দিকে লইয়া গিয়া কোথায় ফেলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

Only the event will teach us in its hour."

এই তেজঃপূর্ণবাক্যে রুস্তমের ক্রোধ আরও উদ্দীপ্ত হইল। আর বাক্যব্যয় না করিয়া রুস্তম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; হস্তস্থিত বর্শা সোরাবকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষিপ্রগতি সোরাব, যে মুহূর্ত্তে বর্শা তাহার অঙ্গে পড়িবে, সেই মুহূর্ত্তে সরিয়া দাঁড়াইল। বর্শাখানি সোঁ করিয়া পাশ দিয়া গিয়া বালুকাতে পড়িয়া তথায় বিদ্ধ হইয়া রহিল। অতঃপর সোরাব ত্বরিত-গতিতে নিজের বর্শা নিক্ষেপ করিল, রুস্তমের ঢালে লাগিয়া তাহা প্রতিনিবৃত্ত হইল। এই প্রকারে এক অস্ত্র ব্যর্থ গেল দেখিয়া, ক্রোধভরে রুস্তম তাঁহার বিশাল গদা গ্রহণ করিলেন ও তাহা নিজের মাথার উপর ঘুরাইয়া সোরাবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া যেই প্রহার করিবেন, অমনি সোরাব পুনরায় পাশ কাটাইয়া এই আঘাত হইতে রক্ষা পাইল। আর রুস্তম গদার সহিত সশব্দে ভূমিতে পতিত হইলেন।

যুদ্ধের নিয়মানুসারে এই অবস্থায় যদি সোরাব রুস্তমকে আহত করিত, তাহাতে দোষ হইত না—এক

অস্ত্রের প্রত্যুত্তরে অন্য অস্ত্র ক্ষেপণ নিয়ম-সম্মত। কিন্তু বিপক্ষকে পতিত দেখিয়া সোরাব অস্ত্রাঘাত না করিয়া মাত্র বলিতে লাগিল, "হে বীর, অত জোরে কি অস্ত্র হানিতে হয়? এই দেখ, তোমারই দেহ শৃগাল-কুকুরের খাদ্য হইবার যোগাড় হইয়াছিল। তা, তোমাকে আঘাত করিতে কেন যেন আমার প্রাণ সরিতেছে না। তোমাকে যতই দেখিতেছি, ততই যেন আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—তোমার প্রতি আমার ঘোর ক্রোধ হওয়াই উচিত, তাহা কেন যেন হইতেছে না। তুমি বলিয়াছ, তুমি রুস্তম নহ, তবু কেন তোমায় দেখিয়া আমি বিকল হইতেছি? ভাবিও না যে, আমি বালক, অতএব কাপুরুষ। আমিও অনেক যুদ্ধ করিয়াছি,—যুদ্ধ-ক্ষেত্রের রক্তারক্তিতেও আমার প্রাণ ক্ষুব্ধ হয় নাই। আজ কেন এমন হইল? দেখ বীরবর, ভগবান্ বুঝি এইরূপেই ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, 'যুদ্ধ করিও না।' এস, ভগবানের নামে আমরা দুজনে অস্ত্রত্যাগ করিয়া এখানে বসি—আমি প্রিয়সুহৃদ্জ্ঞানে তোমায় আলিঙ্গন করিব। তুমি

পারস্যবীর, তোমার নিকট সেই পারস্য-রত্ন রুস্তমের কাহিনী শুনিব। আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ কর। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যেন আমার প্রাণ চাহিতেছে না।"

আকুল প্রাণের এই কথাগুলি, পাঠক, তুমি বুঝিতেছ, কিন্তু ক্রোধান্ধ রুস্তম মনে করিলেন, সোরাব তাঁহাকে করুণা করিতেছে, শ্লেষবাক্য বলিতেছে। উভয় বাহিনীর চক্ষের সম্মুখে তাঁহার মত বীরের ভূমিতে পতন! রুস্তম নিমেষে ধূলা ঝাড়িয়া উঠিলেন, দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন,—"যুদ্ধত্যাগ? কখনই না। এই অপমানের পর যুদ্ধত্যাগ? মূর্খ, তাই কি সম্ভব? আর না। বালক বলিয়া যেটুকু দয়া তোকে করিয়াছিলাম, আর তাহা করিব না। অস্ত্রের ব্যবহার তুই জানিস্ বলিয়া বোধ হয় না। অস্ত্রের সম্মুখ হইতে পলাইতে মাত্র জানিস্, এই তো দেখিতেছি। তুই স্ত্রীলোকেরও অধম—তুই কাপুরুষ—কেবল চাতুরীর উপর যুদ্ধ করিস্। ধর্ অস্ত্র, দেখি, কোন্ চাতুরী এবার তোকে রক্ষা করে!"

এই বিদ্রূপোক্তিতে সোরাব উত্তেজিত হইল, অসি নিষ্কাশিত করিয়া রুস্তমকে আক্রমণ করিল, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাজিয়া উঠিল, ঘোর-শব্দে মনে হইতে লাগিল যেন, মহা মহীরুহের দেহে কুঠারাঘাত হইতেছে ও সমস্ত বনানী তাহাতে শব্দায়মান হইতেছে

কবি বলিতেছেন, এই পিতাপুত্রের যুদ্ধে স্বর্গের দেবতারাও যেন যোগদান করিয়াছেন। কারণ, ঐ দেখ এক অদ্ভুত ব্যাপার! অকস্মাৎ শন্‌-শন্‌ করিয়া কি এক উদাসভাব প্রাণে আনিয়া দিয়া বায়ু বহিয়া যাইতে লাগিল। আর ঠিক এই সময়েই কোথা হইতে এক খণ্ড মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল। আরও আশ্চর্য্য দেখ, ঘূর্ণায়মান বায়ু দ্বারা উত্থিত বালুকাকণাপুঞ্জ এই যোদ্ধা দুটিকে আচ্ছাদন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য দর্শকবৃন্দ হইতে তাহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া তুলিল। প্রকৃতি দেবী যেন এই অসামান্য, এই অপ্রাকৃত পিতা-পুত্রের যুদ্ধ লোকলোচনের সম্মুখে হইতে দিতে চাহিলেন না।

যোদ্ধৃদ্বয় এই প্রকারে ছায়ায় আবৃত হইয়া পর-

স্পরকে আঘাত করিতেছেন—অদূরে আলোকে দাঁড়াইয়া অনিমেষ-নয়নে দর্শন করিতেছে উভয় পক্ষের সৈনিক-দল।

রুস্তম পুনরায় সোরাবকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা হানিলেন, তাহা সোরাবের ঢালে বিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না। সোরাব প্রত্যুত্তরে রুস্তমের মস্তকে অমিত বিক্রমে অসির আঘাত করিল, শিরস্ত্রাণ কাটিয়া গেল, কিন্তু অসি মস্তক পর্য্যন্ত পৌঁছিল না—মাত্র শিরস্ত্রাণের শোভাস্বরূপ যে পালকগুচ্ছ ছিল, তাহা কাটিয়া ভূমিতে পতিত হইল। রুস্তম ক্ষোভে ও রোষে ক্ষণকালের জন্য মস্তক নত করিলেন—এমন অপমান কখনও কোন যুদ্ধে তিনি লাভ করেন নাই।

প্রকৃতিদেবী এই সময়ে আরো ঘোরতরা হইলেন। অকস্মাৎ আকাশে বজ্র কড়-কড় করিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ চমকিল, চরাচর ভীত হইয়া উঠিল—যেন আজ কি প্রলয়-কাণ্ডই হইবে। অদূরে রুস্তমের অশ্ব রুকৃস দাঁড়াইয়াছিল, সহসা সে এই প্রলয়-ব্যাপারের নাদ ভীষণতর করিয়া অমানুষিক হ্রেষারব করিয়া উঠিল, সকলের

প্রাণ যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কায় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রকৃতির এই ঘোর মূর্ত্তি দেখিবার বা উপলব্ধি করিবার যোদ্ধৃদ্বয়ের অবসর ছিল না। সোরাব পুনরায় রুস্তমের মস্তকে সজোরে অসির আঘাত করিল—অসি চূর্ণ হইয়া গেল। আবার রুস্তমকে বিচলিত হইতে হইল। কি! এই বালকের আঘাতে কি আজ মহাবীর রুস্তম কম্পিত হইবেন? তাঁহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল, সমস্ত দেহ তেজে বিশালতর হইল, হস্তের বর্শা দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল। রুস্তম সিংহনাদে হুঙ্কার ছাড়িলেন—"রুস্তম" এবং বেগে সোরাবের প্রতি ধাবিত হইলেন।

"রুস্তম"—এই চীৎকারে, হায় ভগবান্, সোরাব সহসা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল, অমনি এক পদ পশ্চাতে হটিয়া গেল, অবাক্ হইয়া ধাবমান রুস্তমকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হস্ত হইতে অস্ত্র চ্যুত হইল, ঢাল খসিয়া পড়িল, চক্ষের সম্মুখে যেন সব অন্ধকার বোধ হইল। এইরূপে নিরস্ত্র সোরাব বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল মাত্র, আত্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা করার কথা যেন ভুলিয়া গেল।

অমনি রুস্তমের বর্শা আসিয়া সোরাবের দেহে আমূল বিদ্ধ হইল ও সোরাব যুদ্ধক্ষেত্রে টলিয়া পড়িল।

দেবতার কার্য্য শেষ হইল। অমনি আকাশে সূর্য্য হাসিতে লাগিল, মেঘ কাটিয়া গেল, বাতাস নীরব হইল, ধূলির আবরণ সরিয়া গেল, সাশ্চর্য্যে পারসীক ও তুরক পূর্ণালোকে দেখিল—আহত সোরাব ভূমিতে পাতিত ও পাশে দাঁড়াইয়া অনাহত ও প্রফুল্লিতানন রুস্তম।

বিজয়গর্ব্বে রুস্তম বলিলেন, "সোরাব, তুমি মনে করিয়াছিলে যে, আজ একজন পারসীকে পরাজয় করিয়া দেশে গিয়া গর্ব্ব করিবে। অথবা মনে করিয়াছিলে যে, স্বয়ং রুস্তম আসিয়া যদি তোমার সহিত যুদ্ধ করেন, চাতুরীতে ভুলাইয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া লোকের নিকট বড়াই করিবে যে, তুমি রুস্তমের সমকক্ষ হইয়াছ। তাই তুমি রুস্তম সম্বন্ধে অত প্রশ্ন করিয়াছিলে। এখন দেখিতেছ, তোমার এই উভয় আশাতেই ছাই পড়িয়াছে। পিতা-মাতার নিকট তোমার বীরত্বকাহিনী বলিয়া যে অপার সুখলাভ করিবে, তাহার পথ তো আর রহিল না। অপরিচিত আমি

তোমায় পরাজয় করিয়াছি—এখন শৃগাল-কুক্কুরের সাহচর্য্য লাভ কর।”

আহত সোরাব নির্ভয়ে উত্তর করিল, “হে অপরিচিত বীর, বৃথা গর্ব্ব করিও না। তুমি আমাকে মারিতে পার নাই—আমাকে মারিয়াছে রুস্তম—আমার এই পিতৃভক্ত হৃদয়। আমাকে মারিতে কোথায় তোমার শক্তি? তোমার মত দশ জন বীর আসিলেও, এই সোরাবকে পরাজয় করিতে পারিত না—তোমরাই পরাজিত হইতে, রণভূমে অন্য অভিনয় হইত। কিন্তু তুমি যে নাম গ্রহণ করিয়া হুঙ্কার করিয়াছিলে, সেই নামই আমার কাল হইয়াছিল, তাহাতেই আমার বাহুর সমস্ত বল অন্তর্হিত হইয়াছিল। আর বুঝিতে পারিতেছি না, কেন যেন তোমাকে দেখা অবধি আমার প্রাণ আকুল হইয়াছিল। আমার অস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়াছিল—তুমি নিরস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করিয়াছ, অতএব, হে বীর, তোমার এই গর্ব্ব শোভা পায় না। অবিলম্বে তোমার এই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইবে। অজ্ঞান তুমি, তোমায় বলিয়াছি, মনে রাখিও, মহাবীর রুস্তম এই পুত্রবধের

প্রতিশোধ লইবেন—তাঁহারই অন্বেষণে আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়াছি। তোমার আর নিস্তার নাই।"

হায়, রুস্তম জানিতেন না যে, পুত্রবধ করিয়াছেন। তাঁহার তো পুত্র হয় নাই, এই ধারণাই আজীবন ছিল। হতভাগ্য তাই এখনও বুঝিতে পারিতেছে না যে, সে আজ কি অস্বাভাবিক কাজই করিয়া বসিয়াছে! অবি-শ্বাসের হাসি হাসিয়া তাই রুস্তম উত্তর করিলেন, "তুমি কি বকিতেছ? রুস্তমের পুত্রের কথা কি বলিতেছ? রুস্তমের তো কোন কালে পুত্র জন্মে নাই। তুমি নিশ্চয় পাগল হইয়াছ।"

আহত সোরাব ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "তুমি জান না। রুস্তমের পুত্রই হইয়াছিল, এবং আমি অভাগাই সেই পুত্র। তোমার রক্ষা নাই। জানি না, রুস্তম কোথায় আছেন, কিন্তু এই পুত্রবধ-সংবাদ কি তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না? যখন তিনি এই কাহিনী শুনিবেন, যখন তিনি জানিবেন যে, পুত্র তাঁহার দর্শন-লালসায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে ও তাঁহার দর্শনলালসাতেই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুলাভ করিয়াছে—যখন তিনি এই বার্ত্তা পাইবেন,

তখন—হে বীর, কম্পিত হও,—রোষে রুস্তমের সমস্ত শিরা ফুলিয়া উঠিবে, শোকে তিনি উন্মত্ত হইবেন, পুত্র-হন্তার প্রাণ লইতে তিনি ধাবিত হইবেন। হে ভগবান্, মহাবীর রুস্তমের পুত্রশোকের এই উন্মাদ আলোড়ন আমি বুঝি দেখিয়া যাইতে পারিব না!”

একটু থামিয়া সোরাব পুনরায় বলিতে লাগিল, “আর—শোকে মুহ্যমান হইবে আমার কোমলপ্রাণা জননী। হায় মা, দেশে বসিয়া আমার পথ চাহিয়া আছ! আর আমি নিত্য নিত্য বিজয়-গৌরবে দীপ্ত আমার এই মস্তক তোমার পদে নোয়াইতে পারিব না। তোমার অভাগা পুত্র আজ এই আমুদরিয়া-তীরে অজানা এক শত্রুর হস্তে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হইল। পিতা রুস্তম পুত্রহন্তার প্রাণবধ করিয়া পুত্র-শোকের জ্বালা কথঞ্চিৎ শান্ত করিবেন, কিন্তু স্বামিপরিত্যক্তা তোমার এই এক-মাত্র পুত্র আমি, আমার অভাবে তোমার সান্ত্বনা কোথায় মা?”

সোরাব ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, দুই গণ্ড বাহিয়া চক্ষুজলের স্রোত চলিল।

ক্রমে সোরাব থামিয়া থামিয়া তাহার জীবনের সমস্ত বিবরণ বলিল—কিরূপে তাহার মাতা তাহার জন্মের পর বৃথা স্নেহের কারণে রুস্তমকে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র হয় নাই, কন্যা হইয়াছে। সুদূর অতীতের কথা স্বপ্নের মত রুস্তমের মনে উদিত হইতে লাগিল। যৌবনের সেই সকল ঘটনা মনে হইল—কেমন করিয়া তিনি সোরাবের মাতাকে লাভ করিয়াছিলেন। আশা ও ভরসার সেই মধুময় জীবনের স্মৃতি তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল, চক্ষুতে অশ্রুকণা দেখা দিল, সোৎসুকনেত্রে তিনি আহত সোরা-বের প্রতি চাহিলেন—হায়, এ মুমূর্ষু যুবক কি তাঁহার পুত্র? কে জানে? যদি চাতুরী করিয়া রুস্তমের পুত্র বলিয়া সে নিজেকে পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, হয় তো তুরকদিগকেও এইরূপ প্রতারণা করিয়া তাহাদের নিকট নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

রুস্তমের মনের সংশয় গেল না, কিন্তু মৃত্যুপথের পথিক এই আহত যুবকের করুণ-কথায় তাঁহার হৃদয়

বিগলিত হইল, উদ্ধত ভাব দূর হইয়া গেল, অতি কোমল স্বরে তিনি সোরাবকে বলিলেন,—

"তোমার মত বীর পুত্র যদি রুস্তমের থাকিত, তবে আজ রুস্তমের প্রাণ শীতল হইত।

O Sohrab, thou indeed art such a son
Whom Rustum, wert thou his, might
well have loved.

কিন্তু তুমি ভুল করিতেছ। রুস্তমের মাত্র এক কন্যা আছে—মাতার সহিত আদারবাইজানে সে বাস করে। পুত্র তাহার কোন দিনও হয় নাই।"

মরণকালে মানুষে মিথ্যাকথা বলে না।

"Truth sits upon the lips of dying men."

তবু রুস্তম সোরাবের কথা বিশ্বাস করিতেছেন না; ক্রোধে সোরাবের মুখ উদ্দীপ্ত হইল, এক হস্তে ভর দিয়া মস্তক উত্তোলন করিল—আহত স্থান হইতে রক্ত ছুটিল। এক নিশ্বাসে সতেজে সোরাব বলিয়া উঠিল, "পাষণ্ড তুমি! মরণকালে কি আমি মিথ্যা বলিব? জীবনে তো কোন কালে মিথ্যা বলি নাই। আরো প্রমাণ চাও? জান

কি, রুস্তম পত্নীর নিকট এক চিহ্ন দিয়া আসিয়াছিলেন, সন্তান হইলে তাহা নবজাতের গাত্রে খোদিত করিয়া দিতে হইবে? আমি তাহাই তোমায় দেখাইতেছি।”

সহসা রুস্তমের মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, বুকে যেন কি অদ্ভুত ব্যথা বোধ হইল, জানুদ্বয় যেন শিথিল হইয়া আসিল, ভগ্ন-স্বরে ধীরে তিনি বলিলেন, “হাঁ, সেই চিহ্ন দেখাও, তবে নিঃসন্দেহে বুঝিব, তুমি রুস্তমের পুত্র।”

অবিলম্বে ক্ষীণ অঙ্গুলিসঞ্চালনে সোরাব অঙ্গবস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। বাহুমূলে সিন্দুর-রঙ্গে খোদিত গৃধ্র-পক্ষীর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

এই গৃধ্র-পক্ষীর মূর্ত্তিই রুস্তমের চিহ্ন। রুস্তমের পিতা জাল যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সমস্ত কেশগুলি বরফের মত সাদা দেখা গেল। লোকে বলিল, ইহা বড়ই অমঙ্গলের চিহ্ন। অতএব জালকে পর্ব্বত-সানুদেশে পরিত্যাগ করিয়া আসা হইল। এক গৃধ্র লইয়া গিয়া নিজের আবাসে তাহাকে মানুষ করে—

ভগবানের এইরূপই বিচিত্র লীলা। পরে জাল বড় হইলে পিতা কর্ত্তৃক আনীত হইয়া ক্রমে বীরত্বে সকলকে মোহিত করেন। পিতৃভক্ত রুস্তম এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য গৃধ্র-পক্ষীর প্রতিকৃতিকে স্বীয় চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করেন।

বাহুমূলে এই গৃধ্র-চিহ্ন দেখাইয়া সোরাব কঠোর-স্বরে বলিল, "কেমন? রুস্তমের চিহ্ন নিশ্চয় চিন—সকলেই চিনে। এখন তোমার বিশ্বাস হয় যে, আমি রুস্তমের পুত্র—প্রবঞ্চক নহি?"

পাঠক, রুস্তমকে তোমরা ক্ষমা করিও। যে কালের কথা বলিতেছি, তখন এরূপ প্রবঞ্চনার অবধি ছিল না।

এই গৃধ্রচিহ্ন দেখিয়া রুস্তম নির্ব্বাক্ হইলেন। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—পৃথিবী যেন পায়ের নীচে খসিয়া পড়িতেছে। হায়, হতভাগ্য রুস্তম! এ কি করিয়া বসিয়াছ—নিজের পুত্রকে হত্যা করিয়া বসিয়াছ? এই রণে আসিয়া যুবককে দেখিয়া প্রথমেই তাঁহার প্রাণ কেমন করিয়াছিল, তখন কেন

বৃথা যুদ্ধের গর্ব্ব তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছিল? সোরাব তো তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরতই করিয়াছিল! সেই তো হৃদয়হীন পাষণ্ডের মত তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছে? আর—হায়, হায়, সে তো ধর্ম্ম-যুদ্ধও করে নাই—নিরস্ত্র সোরাবকে সে হত্যা করিয়াছে—পিতা হইয়া পিতৃবৎসল পুত্রকে সে বধ করিয়াছে! পুত্রবধ—পুত্রহত্যা,—হে ভগবান্, কোন্ পাপে তাহাকে এই অমানুষিক ব্যাপারে লিপ্ত করিয়াছ?

রুস্তমের বিদীর্ণ হৃদয় হইতে ঘোর এক আর্ত্তনাদ বাহির হইল—"পুত্র রে, এই পাষণ্ডই তোর পিতা।" বলিয়াই রুস্তম মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে ভূতলে পতিত হইলেন।

অদূরে সোরাব বীর-শয্যায় শয়ান। অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়া সে পতিত রুস্তমের নিকট আসিল। আসিয়া দুই বাহুদ্বারা রুস্তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিল, বুকে মুখ লুকাইল, মাথায় হাত বুলাইয়া ক্ষীণস্বরে 'পিতা, পিতা' বলিয়া ডাকিল, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল— হতভাগ্য আজ চির-অভীপ্সিত পিতার ক্রোড় পাই-

য়াছে, আজ মৃত্যুশয্যায় তাহার এ আনন্দ ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

স্নেহস্পর্শে রুস্তমের চেতনা ফিরিয়া আসিল, চক্ষু মেলিতেই সব মনে পড়িল—অহো, কি ভয়ানক! রুস্তম পাগলের মত নিজের কেশ নিজে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, মুষ্টিতে করিয়া রণাঙ্গনের বালি লইয়া নিজের মস্তকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বক্ষ ভেদিয়া আর্ত্তনাদ ছুটিল, মুখে ফেনা উঠিতে লাগিল। অবশেষে স্বীয় অসি লইয়া নিজের বক্ষে বিদ্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সোরাব তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল, স্নেহস্পর্শে অসি শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। তখন সোরাব মৃদু-কণ্ঠে স্নেহ-বিজড়িত ভাষায় কহিতে লাগিল, "পিতা, ক্ষান্ত হউন। বিধাতা আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই ফলিয়াছে।

It was written in heaven that this
should be.

আপনি নিমিত্ত মাত্র। নতুবা যুদ্ধের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আমার হৃদয় আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল,

আপনিও আমায় দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন; তবু সেই পাপ যুদ্ধে আমরা বিধাতার কঠোর বিধানেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার দুঃখ নাই—যে পিতার অন্বেষণে চিরজীবন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, সেই পিতাকে তো পাইয়াছি। আমার আর অধিক সময় বাকী নাই, আসুন, আমার নিকট ক্ষণেকের জন্য প্রকৃতিস্থ হইয়া বসুন, আমাকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করুন, আমায় আপনার অশ্রুতে অভিষিক্ত করুন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করুন, আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হউক, আমি সুখে পরলোকে গমন করি। পিতা, মরণে আমার দুঃখ নাই—আমার শেষ বাসনা পূর্ণ করুন, আমার আর বেশী বিলম্ব নাই।"

পুত্রের স্নেহের বাণী কি মধুর! রুস্তমের কঠিন হৃদয় গলিয়া আজ নেত্রদ্বারে কি মন্দাকিনীই বহাইল! অবাধে রুস্তম কাঁদিলেন। মরণের দ্বারে লব্ধ এই প্রিয় পুত্রকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন—তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন। পাঠক দেখ, কঠিন আজ কি কোমলই হইয়াছে।

রণাঙ্গন ঘিরিয়া পারস্য ও তুরকবাহিনী চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান—এই মহিমময় দৃশ্য দেখিতেছে ও চক্ষের জলে ভাসিতেছে। মূক রুকুস অদূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিয়াছে—এখন এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া, হে পাঠক, তাহারও চক্ষু সজল হইয়াছে। রুস্তমের এই প্রিয় অশ্ব ধীরপদক্ষেপে পিতা ও পুত্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল—একবার রুস্তমের দেহ আঘ্রাণ করিল, আবার সোরাবকে স্পর্শ করিল। হে প্রিয় অশ্ব, এই করুণ রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়াই কি, কাতরভাবে তোমার অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দিয়া ইহাদিগকে প্রশ্ন করিতেছ? আজ যেন মনুষ্য ও পশু একপ্রাণে এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইতেছে।

করুণকণ্ঠে রুস্তম বলিলেন, "হায় রুকুস, কেন তুমি আজ আমায় এই কাল-যুদ্ধে তোমার পৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিয়াছিলে?"

বলিয়াছি, এই প্রাণাধিক রুকুসের অন্বেষণে গিয়াই রুস্তম পত্নীলাভ করিয়াছিলেন। সোরাব সে কাহিনী মাতৃমুখে শুনিয়াছিল, আজ সেই রুকুসকে চর্ম্মচক্ষে

দেখিল। সোৎসুক-নয়নে অশ্ববরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সোরাব বলিতে লাগিল, "এই তবে সেই রুক্‌স? হে অশ্ববর, তোমারই কথা মায়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। এস আমার কাছে এস—তোমার অঙ্গ স্পর্শ করি। ভাগ্যবান্ তুমি, তুমি এমন বীর প্রভু পাইয়াছিলে। ভাগ্যবান্ তুমি, আমার পিতার জন্মস্থান তুমি দেখিয়াছ, আমার পিতামহ জাল তোমায় কত আদর করিয়াছেন—হতভাগ্য আমি, সে স্নেহ আমি ইহজন্মে পাইলাম না। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আমার এই সামান্য জীবন কাল, দেশের ও পিতা-পিতামহের শত্রুর সংসর্গে কাটাইতে হইল। স্বজন-বিচ্যুত এই জীবনের দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। তবু ধন্য আমি যে, জীবনের শেষকালে পিতার ও তোমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছি।"

এই করুণ-বচনগুলি রুস্তমের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিল—গভীর বেদনায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজ যদি এই আমুদরিয়া আমাকে গ্রহণ করে, তবে বুঝি এই জ্বালা ভুলিতে পারি।"

সোরাব পুনরায় বলিতে লাগিল, "পিতা, আত্মঘাতী হইবার বাসনা পোষণ করা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। সংসারে আপনি বীরত্বের কাজ করিতে আসিয়াছেন, তাহাই আপনাকে আজীবন করিতে হইবে। আরো কিছুকাল আপনাকে এই সংসারে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। ভগবান্ আপনার যশোভাগ্য আরো মহৎ করিয়া প্রচার করিবেন। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে। মরণকালে আমার এই প্রার্থনা পূরণ করিবেন। এই তুরকবাহিনী আমার জন্যই এই যুদ্ধে আসিয়াছে—পারস্য-সৈন্যের মধ্যে আপনাকে পাইব বলিয়াই ইহাদিগকে আমি এই সংগ্রামে প্ররোচিত করিয়াছি, অতএব আমার অভাবে আর ইহাদের সহিত যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নাই। ইহাদিগকে স্বদেশে নিরুপদ্রবে ফিরিতে দিবেন। আর এক ভিক্ষা চাই যে, আমার মৃতদেহ আমার পিতাপিতামহের দেশে লইয়া গিয়া প্রোথিত করিবেন। স্বর্গ হইতে আমার আত্মা দেখিয়া প্রীত হইবে যে, আমার পিতা, আমার পিতামহ—হতভাগ্য আমি, সে মহাত্মাকে দেখিবার সাধ

পূর্ণ হইল না—ও আমার স্বজাতি সকলে মিলিয়া আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিয়াছে। আমার কবরের উপর উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন ও আমার জীবনের করুণ কাহিনী তাহাতে খোদিত করাইয়া দিবেন।”

সোরাব নীরব হইল। রুস্তম আকুল-কণ্ঠে কহিলেন, “পুত্র, তুমি যাহা বলিলে, আমি সব করিব। এই যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিব ও তোমার মৃতদেহ স্বদেশে লইয়া গিয়া, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে তোমায় সমাহিত করিব। তোমার সমাধিস্তম্ভ দেখিয়া চিরকাল লোকের মুখে ধ্বনিত হইবে—

পারস্যের বীর রুস্তম-তনয়
অভাগা সোরাব নাম,
পিতৃহস্তে বধ লভিয়া বিপাকে
হেথা করিছে বিশ্রাম।

কিন্তু পুত্র, আমার প্রাণে কি আর শান্তি আসিবে? এ বিপুল বীরত্ব-যশঃ এখন আমার কণ্টক-স্বরূপ হইবে।

হায়, যদি আমি সামান্য লোক হইতাম, আমার এ বীরত্ব-যশঃ না থাকিত, তবে তো আর তোমায় এরূপভাবে হত্যা করিতাম না। আর হে ভগবান্, আজ এই রণ-ক্ষেত্রে আমায় কেন পাতিত করিলে না? পুত্রহস্তে আমারই কেন নিধন হইল না? আমার প্রাণাধিক পুত্রই তাহা হইলে আজ জীবিত থাকিত, আমার উপযুক্ত পুত্র আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিত। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! যুদ্ধের কঠোর জীবনে যৌবন কাটাইয়াছি, বার্দ্ধক্যেও আমায় সেই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকিতে হইবে। ভগবানের এ কি কঠোর অভিশাপ!"

মৃত্যু-মিলনে সোরাবের আজ উৎফুল্ল—হৃদয়ের সমস্ত খেদ কাটিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে তিনি নয়ন মুদিলেন, পিতার স্নেহ-ক্রোড়ে চির-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন—সব শেষ হইল!

ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল; মৃতপুত্র-পার্শ্বে সমাসীন রুস্তমকে এবং পারস্য ও তুরকবাহিনীকে অল্পে অল্পে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ক্রমে সৈন্যগণ

আপন আপন শিবিরে ফিরিয়া গেল। নদীপারে বালু-রাশিমধ্যে রহিল মাত্র একাকী রুস্তম, ক্রোড়ে মৃতপুত্র, অদূরে নিস্তব্ধ রুক্স ও সম্মুখে কল-তান-বাহিনী সমুদ্র-গামিনী আমুদরিয়া।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিষের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিমান্ গ্রন্থকারবর্গ রচিত সারবান্ সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দুর্দ্দিন ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থগুলি একত্রে গ্রহণ করিয়া অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রী দ্বারা গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না; প্রতি বাংলা মাসে নূতন পুস্তক বাহির হইলেই, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে হইবে না।

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

পল্লী-সমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ

বিবাহ-বিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ

চন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

বড়বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

অরক্ষণীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বেগম সমরু—(সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি, এ. বি এল্

সুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্, এ

মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রসির ডায়ারী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ

নব-বর্ষের-স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

হিসাব-নিকাশ—শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইংরেজী কাব্য-কথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ

জলছবি—(যন্ত্রস্থ) শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা